POSTAL REG NO GDP- 43 / 2023--2025

আল্লাহ্‌র বাণী

لَقَدۡ کَفَرَ الَّذِیۡنَ قَالُوۡۤا اِنَّ اللّٰہَ ثَالِثُ ثَلٰثَۃٍ ۘ
وَمَا مِنۡ اِلٰہٍ اِلَّاۤ اِلٰہٌ وَّاحِدٌ ؕ وَاِنۡ لَّمۡ یَنۡتَہُوۡا
عَمَّا یَقُوۡلُوۡنَ لَیَمَسَّنَّ الَّذِیۡنَ کَفَرُوۡا
مِنۡہُمۡ عَذَابٌ اَلِیۡمٌ (المائدہ:74)

নিশ্চয় তাহারা কুফরী করিয়াছে যাহারা বলে, 'আল্লাহ্ তিনের মধ্যে তৃতীয়'; অথচ এক মা'বুদ ব্যতীত কোন মা'বুদ নাই। এবং তাহারা যাহা বলিতেছে উহা হইতে তাহারা যদি নিবৃত্ত না হয় তাহা হইলে তাহাদের মধ্যে যাহারা অস্বীকার করিয়াছে তাহাদিগকে নিশ্চয় যন্ত্রণাদায়ক আযাব স্পর্শ করিবে।

(আল মায়েদা: ৭৪)

بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علیٰ رسولہ الکریم وعلیٰ عبدہ المسیح الموعود
وَلَقَدۡ نَصَرَکُمُ اللّٰہُ بِبَدۡرٍ وَّاَنۡتُمۡ اَذِلَّۃٌ

খণ্ড 10

বদর

সাপ্তাহিক কাদিয়ান

Weekly BADAR Qadian Bangla

www.akhbarbadarqadian.in

সংখ্যা 5

সম্পাদক: তাহের আহমদ মুনির

সহ-সম্পাদক: মির্যা সফিউল আলাম

বৃহস্পতিবার 30 Jan 2025 29 রজব-1446 A.H

আহমদীয়া সংবাদ

সৈয়্যদনা হযরত আমীরুল মোমিনীন খলীফাতুল মসীহ আল খামেস (আইঃ) আল্লাহর কৃপায় কুশলে আছেন। আলহামদো লিল্লাহ। জামাতের সদস্যদের নিকট হুযূর আনোয়ারের সুসাস্থ্য ও দীর্ঘায়ু এবং হুযুরের যাবতীয় উদ্দেশ্যাবলী পূর্ণ হওয়ার জন্য ও তাঁর সুরক্ষার জন্য দোয়ার আবেদন রইল। আল্লাহ তা'লা সর্বদা হুযুরের রক্ষক ও সাহায্যকারী হউক। আমীন।

আহমদীয়াতের কেন্দ্রভূমি কাদিয়ান দারুল আমান- এ ১২৯ তম সালানা জলসা মহাসমারোহে সুসম্পন্ন হল।

"আমি সত্য সত্য বলছি, এ দেশের পালাও ঘনিয়ে এসেছে। নুহের যুগের ছবি তোমাদের চোখের সামনে ফুটে উঠবে আর লুতের যুগের ঘটনা তোমরা স্বচক্ষে দর্শন করবে।কিন্তু খোদা শাস্তি প্রদানে ধীর। অনুতপ্ত হও, যাতে তোমাদের প্রতি করুনা প্রদর্শিত হয়। যে ব্যক্তি খোদাকে ত্যাগ করে, সে মানুষ নয়, কীট। যে তাঁকে ভয় করে না, সে জীবিত নয়, মৃত।"

বিগত দুই দশক থেকে সৈয়্যদানা হযরত আমীরুল মোমেনীন বিশ্বকে তৃতীয় মহাযুদ্ধের বিপদ সম্পর্কে সতর্ক করে আসেছন আর জামাতের সদস্যদেরকেও দোয়ার পাশাপাশি নিজেদের সংশোধন ও তরবীয়তের প্রতি বিশেষ দৃষ্টি আকর্ষণ করছেন, যাতে জামাতের সদস্যরা এই বিশ্বজনীন ভয়াবহ ধ্বংসযজ্ঞের কুপ্রভাব থেকে নিজেদের ও নিজেদের ভবিষ্যত প্রজন্মকে রক্ষা করতে পারে।

যে ব্যক্তি ব্যবস্থাপনা থেকে এক বিঘত পরিমাণও বিচ্ছিন্ন হয়, তার মৃত্যু হবে অজ্ঞতার মৃত্যু। (যুগ খলীফা)

দ্বিতীয় দিন, প্রথম অধিবেশন

এই অধিবেশ মাননীয় মুনীর আহমদ হাফজাবাদি, সেক্রেটারী মজলিস কারপারদরাজ বেহেশতি মাকবারা কাদিয়ান-এর সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত হয়। কুরআন করীমের তিলাওয়াত করেন জামিয়া আহমদীয়ার ছাত্র শেখ মহম্মদ এহিয়া এবং এর উর্দু অনুবাদ উপস্থাপন করেন মাননীয় মৌলবী আব্দুল ওকীল নিয়াজ সাহেব, নায়েব নাযের ইসলাহ ও ইরশাদ, জুনুবী হিন্দ, কাদিয়ান। এরপর মাননীয় ইয়াসির আহমদ নায়েক হযরত মসীহ মওউদ (আ.)-এর নযম পরিবেশন করেন-

"হামেঁ উস ইয়ার সে তাকওয়া আতা হ্যায়/ না ইয়ে হাম সে কি এহসানে খোদা হ্যায়।"

অধিবেশনের প্রথম বক্তব্য রাখেন মাননীয় কে.তারিক আহমদ সাহেব, এডিশিনাল নাযির ইসলাহ ও ইরশাদ। তাঁর বক্তব্যের বিষয়বস্তু ছিল 'বিশ্ব-যুদ্ধের কুপ্রভাব থেকে নিরাপদ থাকার জন্য হুযুর আনোয়ার (আই.)-এর নির্দেশাবলী।' তিনি সূরা বনী ইসরাঈল-এর ১৬ নম্বর আয়াতের অনুবাদ উপস্থাপন করার পর ভবিষ্যদ্বাণী সম্পর্কে হযরত মসীহ মওউদ (আ.)-এর দুটি উদ্ধৃতি উপস্থাপন করেন।

তিনি বলেন, আজকের যুগে প্রতিটি মানুষ অশান্তির শিকার। তাদের চোখের সামনে শান্তি ও সম্প্রীতির পরিবেশ নষ্ট হচ্ছে বা এই সংক্রান্ত ঘটনাবলী তারা শুনতে পাচ্ছে। পৃথিবীর বিভিন্ন অংশে যুদ্ধের আগুন জ্বলছে। বর্তমান যুগে খোদার প্রকোপ আরো একটি বিশ্ব-যুদ্ধ রূপে প্রকাশ পেতে পারে। এবিষয়ে কোন সন্দেহ নেই যে, এমন যুদ্ধের কুপ্রভাব এবং বিনাশলীলা কোনও গতানুগতিক যুদ্ধ কিম্বা বর্তমান প্রজন্ম পর্যন্তই সীমাবদ্ধ থাকবে না।বস্তুত এর ভয়াবহ পরিণাম আগমী কয়েকটি প্রজন্ম পর্যন্ত প্রকাশ পেতে থাকবে। শেষ যুগের ইমাম হযরত আকদস মসীহ মওউদ (আ.)-এর আজীবন মুসলমান জাতিকে এবং সমগ্র জগতকে বারবার এ বিষয়ে সতর্ক করেছেন যে, যদি তারা প্রায়শ্চিত্ত না করে এবং প্রকৃত খোদা ও তাঁর রসুল ও যুগ ইমামের প্রতি ঈমান না আনে, তবে আল্লাহ্ তা'লার কঠোর শাস্তির কবলে পড়বে। ইতিহাস এখন অতীতের অন্ধকার অধ্যায়গুলির পুনরাবৃত্তি করতে চলেছে আর খোদা স্বীয় রুদ্র-মূর্তি প্রকাশ করতে চলেছেন। বর্তমান যুগের চিত্রায়ন করতে গিয়ে হযরত মসীহ মওউদ (আ.)বলেন-

"আমি সত্য সত্য বলছি, এ দেশের পালাও ঘনিয়ে এসেছে। নুহের যুগের ছবি তোমাদের চোখের সামনে ফুটে উঠবে আর লুতের যুগের ঘটনা তোমরা স্বচক্ষে দর্শন করবে।কিন্তু খোদা শাস্তি প্রদানে ধীর। অনুতপ্ত হও, যাতে তোমাদের প্রতি করুনা প্রদর্শিত হয়। যে ব্যক্তি খোদাকে ত্যাগ করে, সে মানুষ নয়, কীট। যে তাঁকে ভয় করে না, সে জীবিত নয়, মৃত।"

(হাকীকাতুল ওহী, রুহানী খাযায়েন, খণ্ড-২২, পৃ: ২৬৯)

তিনি বলেন, তৃতীয় বিশ্ব-যুদ্ধের কুপ্রভাব থেকে রক্ষা পাওয়ার একমাত্র পথ হল খোদার প্রতি বিনত হওয়া এবং খোদা তা'লাকে নিজেদের সাহায্যকারী হিসেবে গ্রহণ করা। বিগত দুই দশক থেকে সৈয়্যদানা হযরত আমীরুল মোমেনীন বিশ্বকে তৃতীয় মহাযুদ্ধের বিপদ সম্পর্কে সতর্ক করে আসেছন আর জামাতের সদস্যদেরকেও দোয়ার পাশাপাশি নিজেদের সংশোধন ও তরবীয়তের প্রতি বিশেষ দৃষ্টি আকর্ষণ করছেন, যাতে জামাতের সদস্যরা এই বিশ্বজনীন ভয়াবহ ধ্বংসযজ্ঞের কুপ্রভাব থেকে নিজেদের ও নিজেদের ভবিষ্যত প্রজন্মকে রক্ষা করতে পারে।

অধিবেশনের দ্বিতীয় বক্তব্য রাখেন মাননীয় মুজাফফর আহমদ নাসের সাহেব, নায়ের ইসলাহ ও ইরশাদ, মারকাযিয়া,কাদিয়ান। তাঁর বক্তব্যের বিষয়বস্তু ছিল 'যুগ-খলীফার মর্যাদা, খিলাফতের আনুগত্য, সম্পর্ক স্থাপনের গুরুত্ব ও কল্যাণ।' তিনি সূরা নুর-এর ৫৬ নং আয়াত তিলাওয়াত করেন এবং এর অনুবাদ উপস্থাপন করে হযরত মসীহ মওউদ (আ.)-এর ভাষায় খিলাফতের অর্থ বর্ণনা করেন।

বক্তা খিলাফতের সঙ্গে সম্পৃক্ত থাকার গুরুত্বের বিষয়ে একটি হাদীস বর্ণনা করেন। হযরত ইবনে আব্বাস (রা.)-এর পক্ষ থেকে বর্ণিত হয়েছে যে, রসুলুল্লাহ্ (সা.) বলেছেন, যে ব্যক্তি নিজের শাসকের মধ্যে কোনও অপ্রিয় বিষয় লক্ষ্য করে, তার উচিত ধৈর্য ধারণ করা। কেননা, যে ব্যক্তি ব্যবস্থাপনা থেকে এক বিঘত পরিমাণও বিচ্ছিন্ন হয়, তার মৃত্যু হবে অজ্ঞতার মৃত্যু।

সম্মানীয় বক্তা আনুগত্যের বিষয়ে হযরত আব্দুল্লাহ্ রওয়াহ এবং হযরত খালিদ বিন ওয়ালীদ (রা.)-এর দৃষ্টান্ত উপস্থাপন করেন। তিনি বলেন, আখেরীনদের যুগেও রসুল করীম (সা.)-এর প্রাণদাস হযরত মির্যা গোলাম আহমদ কাদিয়ানী মসীহ ও মওউদ (আ.) এবং তাঁর খলীফাদের আনুগত্যের এমন প্রকৃষ্ট দৃষ্টান্ত পাওয়া যায় যে, মহানবী (সা.)-এর যুগের মুসলমানদের স্মৃতি জেগে ওঠে।

(এরপর ১২ পাতায়.....)

প্রিন্টার ও পাবলিশার জামিল আহমেদ নাসের ফজলে উমর প্রিন্টিং প্রেস কাদিয়ান থেকে মুদ্রণ করে আখবার বদর কাদিয়ান অফিস থেকে প্রকাশ করছে: প্রো: তত্বাবধায়ক, বদর বোর্ড কাদিয়ান

জুমআর খুতবা

“মোমেনদের জামাত একটি প্রাণ সদৃশ্য। তাদের মধ্যে কেউ যদি কোন কাফেরকে আশ্রয় দেয়, তবে তাকে সম্মান আবশ্যক।”

এরপর আঁ হযরত (সা.) জয়নব (রা.)-এর প্রতি দৃষ্টি দিয়ে বললেন,

“যাকে তুমি আশ্রয় দিয়েছ, তাকে আমরাও আশ্রয় দিচ্ছি।” (সীরাত খাতামান্নবীঈন)

বাহ্যত মুসলিম-অধ্যুষিত দেশগুলোর বিরুদ্ধে তাদের উদ্দেশ্য ভয়ানক বলে মনে হচ্ছে। আর এই দৃষ্টিকোণ থেকে কোনো দেশই নিরাপদ নয়। এই প্রেক্ষিতে পাকিস্তানের জন্যও দোয়া করুন, ইরানসহ অন্যান্য দেশের জন্যও দোয়া করুন। আল্লাহ্ তা'লা মুসলমানদের বিবেক ও চেতনাবোধ দান করুন। আর তাদের মাঝে থাকা দলাদলি ও ক্ষমতা লাভের লালসা যেন দুর হয়ে যায় আর তারা যেন ঐক্যবদ্ধ হয়ে যায়।

সৈয়্যদনা আমিরুল মো'মিনিন খলিফাতুল মসীহ্ আল খামিস (আইঃ) কর্তৃক লন্ডনের টিলফোর্ড স্থিত মসজিদে মুবারকে প্রদত্ত ২০ ডিসেম্বর, ২০২৪, এর জুমুআর খুতবা (২০ ফাতাহ,, ১৪০৩ হিজরী শামসী)

সৌজন্যে: আল-ফযল ইন্টারন্যাশনাল লন্ডন

أَشْهَدُ أَنْ لَّا إِلٰهَ إِلَّا اللّٰهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ

أَمَّا بَعْدُ فَأَعُوذُ بِاللّٰهِ مِنَ الشَّيْطٰنِ الرَّجِيمِ - بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيمِ -

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعٰلَمِيْنَ - الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ - مٰلِكِ يَوْمِ الدِّيْنِ - اِيَّاكَ نَعْبُدُ وَاِيَّاكَ نَسْتَعِيْنُ -

اِهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيْمَ - صِرَاطَ الَّذِيْنَ اَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ غَيْرِ الْمَغْضُوْبِ عَلَيْهِمْ وَلَا الضَّآلِّيْنَ -

তাশাহ্হুদ, তা'উয এবং সূরা ফাতিহা পাঠের পর হুযূর আনোয়ার (আই.) বলেন, বিভিন্ন সারিয়্যা ও যুদ্ধের ঘটনার আলোকে মহানবী (সা.)-এর জীবনচরিত বর্ণনা করা হচ্ছে। এ প্রসঙ্গে ইতিহাসে উকাশা বিন মিহসানের সারিয়্যারও উল্লেখ পাওয়া যায়। উকাশা বিন মিহসানের এই অভিযান গামার মারযূকের দিকে হয়েছিল। ষষ্ঠ হিজরীর রবিউল আউয়াল মাসে এই অভিযান পরিচালিত হয়।

(সুবুলুল হুদা ওয়ার রিশাদ, ৬ষ্ঠ খণ্ড, পৃ: ৭৭)

হযরত মির্যাবশীর আহমদ সাহেব (রা.) সীরাত খাতামান্ নবীঈন পুস্তকে লিখেছেন, “ মহানবী (সা.) তাঁর একজন মুহাজির সাহাবী উকাশা বিন মিহসান (রা.)-র নেতৃত্বে চল্লিশজন মুসলমানের একটি দল বনু আসাদ গোত্রের মোকাবিলা করার জন্য প্রেরণ করেন। এই গোত্রটি তখন মদীনা থেকে মক্কাভিমুখে কয়েক দিনের দূরত্বে অবস্থিত গামার নামক একটি কূপের ঝরনার কাছে শিবির স্থাপন করছিল। তাদের দুষ্কৃতি রুখে দেবার জন্য উকাশা (রা.)-র দলটিদ্রুতগতিতে সফর করে গামারে পৌঁছে, যেন তাদের কৃতষড়ুযন্ত্র প্রতিহত করা যায়। জানা যায়, (বনু আসাদ) গোত্রের লোকেরা মুসলমানদের আগমনের সংবাদ পেয়ে দিগ্‌বিদিক ছত্রভঙ্গ হয়ে গিয়েছিল। তখন উকাশা (রা.) ও তার সঙ্গীরা মদীনায় ফেরত চলে আসেন আর (সেখানে) কোনো লড়াই হয়নি।”

(সীরাত খাতামুন্নবীঈন, পৃ: ৬৬৬)

একইভাবে মুহাম্মদ বিন মাসলামার সারিয়্যারওউল্লেখ পাওয়া যায়। ষষ্ঠ হিজরীর রবিউস সানী মাসে এই অভিযান পরিচালিত হয়। মহানবী (সা.) হযরত মুহাম্মদ বিন মাসলামা (রা.)-কে বনু সালাবা ও বনু আউয়ালগোত্রের উদ্দেশ্যে প্রেরণ করেন, যারাযুল কাস্‌সায় বসবাস করতো। আর যুল কাস্‌সামদীনা থেকে রাবাযা-র পথে ২৪ মাইল দূরত্বে অবস্থিত। মহানবী (সা.) হযরত মুহাম্মদ বিন মাসলামা (রা.)-রসাথে দশজনকে প্রেরণ করেছিলেন। এই দলটি রাতের বেলায় সেখানে পৌঁছে। তারা হযরত মুহাম্মদ বিন মাসলামা (রা.) ও তার সঙ্গীদেরকে ঘুমন্ত অবস্থায় ঘিরে ফেলে এবং শত্রুরা সংখ্যায় একশজন ছিল। শত্রুরা তির দিয়ে মুসলমানদেরকে ঘিরে না ফেলা পর্যন্ত তারা (এটি) বুঝতেই পারেন নি। হযরত মুহাম্মদ বিন মাসলামা (রা.) ত্বরিৎজেগে ওঠেন আর তার কাছে ধনুক ছিল। তিনি তার সঙ্গীদেরকে উচ্চৈঃস্ব রে ডেকে বলেন, (নিজেদের) অস্ত্র হাতে তুলে নাও। তারা সবাই চটজলদি উঠে যান। রাতের এক প্রহর (উভয় পক্ষের মধ্যে) তির বিনিময় চলতে থাকে। (কিছুক্ষণ উভয় পক্ষের মাঝে তির নিক্ষেপ চলতে থাকে।) এরপর বেদুইনরা বল্লম দিয়ে আক্রমণ করে বাকি যারা জীবিত ছিলেন তাদের সবাইকে শহীদ করে দেয় আর মুহাম্মদ বিন মাসলামা (রা.)আহত হয়ে (মাটিতে) লুটিয়ে পড়েন। তার গোড়ালিতে এমন আঘাত লেগেছিল যার ফলে তিনি নড়াচড়া করতে পারছিলেন না। আর শত্রুরা তার গায়ের কাপড় খুলে নিয়ে চলে যায়। একজন মুসলমান শহীদদের পাশ দিয়ে যাবার সময় (শহীদদের দেখে) ইন্নালিল্লাহি ওয়া ইন্না ইলাইহি রাজেউন পাঠ করেন। মুহাম্মদ বিন মাসলামা (রা.) তার শব্দ শুনে নড়ে ওঠেন। তিনি (তথা সেই সাহাবী) তাকে খাবার দেন এবং নিজের বাহনে করে তাকে মদীনায় নিয়ে আসেন।

(সুবুলুল হুদা ওয়ার রিশাদ, ৬ষ্ঠ খণ্ড, পৃ: ৭৯)

মুহাম্মদ বিন মাসলামা (রা.)-র সঙ্গীদের শাহাদাতের জন্য দায়ী শত্রুদের বিরুদ্ধে প্রতিশোধ গ্রহণের জন্যও একটি অভিযানের উল্লেখ পাওয়া যায়। এই অভিযানকে হযরত আবু উবায়দা বিন জার্‌রাহ্'র সারিয়্যাবলে। এর বিশদ বিবরণে হযরত মির্যা বশীর আহমদ সাহেব (রা.) লিখেছেন, মহানবী (সা.) যখন এই ঘটনা সম্পর্কে অবগত হন, অর্থাৎ যুল কাস্‌সায় মুহাম্মদ বিন মাসলামা (রা.)-র সঙ্গীদের শাহাদাতের সংবাদ জানতে পারেন, তখন তিনি (সা.) আবু উবায়দা ইবনুল জার্‌রাহ্ (রা.)-কে, যিনি একজন কুরাইশ এবং জ্যেষ্ঠ সাহাবীদের মাঝে গণ্য হতেন, মুহাম্মদ বিন মাসলামা (রা.)-র প্রতিশোধ গ্রহণের জন্য যুল কাস্‌সা অভিমুখে প্রেরণ করেন। আর যেহেতু ইতঃমধ্যে এই সংবাদও এসে গিয়েছিল যে, বনু সালাবা গোত্রের লোকেরা মদীনার উপকণ্ঠে আক্রমণ করার দুরভিসন্ধি রাখে- তাই মহানবী (সা.) আবু উবায়াদা (রা.)-র নেতৃত্বে চল্লিশজন চৌকস সাহাবীর (একটি) দল প্রেরণ করেন এবং নির্দেশ দেন, রাতভর সফর করে তারা যেন প্রত্যুষে সেখানে পৌঁছে যান। আবু উবায়দা (রা.) নির্দেশ পালন করে ঠিক ফজরের নামাযের সময় গিয়ে তাদের ওপর আক্রমণ করেন। আর তারা এই অতর্কিত আক্রমণে বিচলিত হয়ে যৎসামান্য প্রতিরোধের পর পলায়ন করে নিকটবর্তী পাহাড়ে গিয়ে আশ্রয় নেয়। আবু উবায়দা (রা.) গনিমতের সম্পদ করায়ত্ত করে মদীনা অভিমুখে ফিরে আসেন।

এই অভিযানে যে দুইজন সাহাবীর উল্লেখ রয়েছে, অর্থাৎ মুহাম্মদবিন মাসলামা এবং আবু উবায়দা ইবনুল জার্‌রাহ্ (রা.)- তারা উভয়ে জ্যেষ্ঠ সাহাবীদের অন্তর্ভুক্ত ছিলেন। মুহাম্মদ বিন মাসলামা (রা.) তার ব্যক্তিগত গুণাবলি এবং যোগ্যতা ছাড়াও ইহুদী (নেতা) কা'ব বিন আশরাফ হত্যার হিরোবা নায়ক ছিলেন, কেননা তার হাতেই এই নৈরাজ্যবাদির ভবলীলা সাঙ্গ হয়েছিল। মুহাম্মদ বিন মাসলামা (রা.) আনসারের অওস গোত্রের সদস্য ছিলেন। হযরত উমর (রা.)-র খিলাফতকালে তাকে তাঁর বিশেষ আস্থাভাজন জ্ঞান করা হতো। আর এ কারণে উমর (রা.) সাধারণত তাকেই নিজের গভর্নরদের বিষয়ে বিভিন্ন অভিযোগ তদন্তের জন্য প্রেরণ করতেন। হযরত উসমান (রা.)-র মৃত্যুর পর মুসলমানদের মাঝে যখন অভ্যন্তরীণ নৈরাজ্যের দ্বার উন্মোচিত হয় তখন মুহাম্মদ বিন মাসলামা (রা.) নিজের তরবারিকে একটি পাথরে আঘাত করে ভেঙে ফেলে নিজের হাতে একটি লাঠি তুলে নেন। কেউ এর কারণ জিজ্ঞেস করলে তিনি (উত্তরে) বলেন, মহানবী (সা.)-এর কাছ থেকে আমি একথাই শুনেছি, ‘মুসলমানদের মাঝে যখন পারস্পরিক হত্যা, খুন ও অরাজকতার দ্বার উন্মোচিত হবে তখন তুমি তরবারি ভেঙে বাড়িতে এমনভাবে নির্জনে বসে থাকবে যেভাবে কোনো কক্ষে এর মেঝে পড়ে থাকে।' এই আদেশ সম্ভবত মুহাম্মদ বিন মাসলামা (রা.)-র জন্য অথবা কেবল সেই নৈরাজ্যের জন্য বিশেষভাবে প্রযোজ্য ছিল, নতুবা কোনো কোনো সময় অভ্যন্তরীণ নৈরাজ্যের মোকাবিলা বা প্রতিহত করাও একটি প্রকৃষ্ট ধর্মসেবার বৈশিষ্ট্য রাখে।

দ্বিতীয় সাহাবী ছিলেন হযরত আবু উবায়দা ইবনুল জার্‌রাহ্ (রা.)। তিনিও শীর্ষস্থানীয় সাহাবীদেরএকজন ছিলেন এবং কুরাইশী ছিলেন। তার

উচ্চপদমর্যাদার বিষয়টি এর মাধ্যমেও প্রকাশ পায় যে, মহানবী (সা.) তাকে ‘আমীনুল মিল্লাত’উপাধিতে ভূষিত করেছিলেন। মহানবী (সা.)-এর তিরোধানের পর হযরত আবু বকর (রা.) যে দুইজন সাহাবীকে খিলাফতের যোগ্য মনে করেছিলেন তাদের মধ্যে তিনিও একজন ছিলেন। আবু উবায়দা (রা.) হযরত উমর (রা.)-র যুগে প্লেগের মহামারিতে মৃত্যুবরণ করে শহীদ হন।”

(সীরাত খাতামান্নবীঈন, পৃ: ৬৬৮-৬৬৯)

এরপর আরেকটি যুদ্ধাভিযান হলোযায়েদ বিন হারেসার সারিয়্যাযা বনু সুলায়েম (গোত্র) অভিমুখে প্রেরণ করা হয়। এ সম্পর্কে হযরত মির্যা বশীর আহমদ সাহেব (রা.) লেখেন, ৬ষ্ঠ হিজরীর রবিউস সানী মাসে মহানবী (সা.) তাঁর মুক্তকৃত দাস যায়েদ বিন হারেসা (রা.)-র নেতৃত্বে কয়েকজন মুসলমানকে বনু সুলায়েম গোত্র অভিমুখে প্রেরণ করেন। এই গোত্র তখন নাজদ অঞ্চলের জামুম নামক স্থানে বসবাস করত আর দীর্ঘকাল যাবৎ মহানবী (সা.)-এর বিরুদ্ধে শত্রুতা পোষণ বা লড়াই করে আসছিল। খন্দকের যুদ্ধেও মুসলমানদের বিরুদ্ধে এই গোত্রের অংশগ্রহণ উল্লেখযোগ্য ছিল। যায়েদ বিন হারেসা (রা.) এবং তার সঙ্গীরা যখন জামুমে পৌঁছেন, যা মদীনা থেকে প্রায় পঞ্চাশ মাইল দূরত্বে অবস্থিত ছিল, তখন তা জনমানবশূন্য দেখতে পান। কিন্তু ইসলামবিদ্বেষী মুযায়না গোত্রের হালীমা নামের একজন নারীর মাধ্যমে তারা সেই স্থানের সন্ধান লাভ করেন যেখানে তখন বনু সুলায়েম গোত্রের একটি অংশ নিজেদের গবাদি পশুগুলোকে চরাচ্ছিল। কাজেই এই তথ্যকে পুঁজি করে যায়েদ বিন হারেসা (রা.)সেই স্থানে আক্রমণ করেন। এই অতর্কিত আক্রমণে বিচলিত হয়ে অধিকাংশ মানুষ দিগ্বিদিক পলায়ন করে ছত্রভঙ্গ হয়ে যায়, কিন্তু কয়েকজন বন্দি এবং গবাদি পশু মুসলমানদের হস্তগত হয়, যেগুলো নিয়ে তারা মদীনায় ফিরে আসেন। ঘটনাচক্রে সেই বন্দিদের মাঝে হালীমার স্বামীও ছিল। তবে যদিও সে বিরোধী যোদ্ধা ছিল, যুদ্ধ করত।

মহানবী (সা.) হালীমার সেই সাহায্য অর্থাৎ তথ্য সরবরাহ করার কারণে মুক্তিপণ ছাড়া শুধুমাত্র হালীমাকেই নয় বরং তার স্বামীকেও দয়াপরবশ হয়ে ছেড়ে দেন এবং হালীমা ও তার স্বামী সানন্দে স্বদেশে প্রত্যাবর্তন করে।”

(সীরাত খাতামান্নবীঈন, পৃ: ৬৬৯)

অনুরূপভাবে যায়েদ বিন হারেসার যুদ্ধাভিযানের উল্লেখ পাওয়া যায় যা ঈস অভিমুখে প্রেরণ করা হয়েছিল। সীরাত খাতামান্ নবীঈন পুস্তকে এর বিশদ বিবরণ এভাবে বর্ণিত হয়েছে: মহানবী (সা.) ষষ্ঠ হিজরীর জমাদিউল আউয়াল মাসে তাকে অর্থাৎ যায়েদ বিন হারেসাকে একশ সত্তরজন সাহাবীর নেতৃত্ব দিয়ে পুনরায় মদীনা থেকে প্রেরণ করেন। জীবনীকারগণ এ যুদ্ধাভিযানের কারণ বর্ণনা করে লিখেছেন, মক্কারকুরাইশের একটি দল সিরিয়া থেকে ফেরত আসছিল। তাদেরকে প্রতিহত করার জন্য মহানবী (সা.)এ দলটিকে প্রেরণ করেছিলেন। কুরাইশের কাফেলাগুলো সর্বদা সশস্ত্র থাকত আর মক্কা ও সিরিয়ার মাঝে যাতায়াত করার সময় তারা একেবারে মদীনার কোল ঘেঁষে আসা-যাওয়া করত। এ কারণে তাদের পক্ষ থেকে সর্বদা বিপদের আশঙ্কা ছিল। এছাড়া এসব কাফেলা যেদিক দিয়েই যাতায়াত করত, আরবের গোত্রগুলোকে মুসলমানদের বিপক্ষে প্ররোচিত করতে থাকত। যে কারণে দেশজুড়ে মুসলমানদের বিপক্ষে শত্রুতার এক ভয়াবহ আগুন প্রজ্বলিত হয়েছিল। তাই এদেরকে প্রতিহত করা আবশ্যক হয়ে পড়েছিল। যাহোক, মহানবী (সা.) উক্ত কাফেলার সংবাদ পেয়ে যায়েদ বিন হারেসা (রা.)-কে সেদিকে প্রেরণ করেন আর তিনি অত্যন্ত বুদ্ধিমত্তা ও সতর্কতার সাথে এমনভাবে অগ্রসর হন যে, ঈস নামক স্থানে গিয়ে সেই কাফেলাকে ধরে ফেলেন। ঈস একটি জায়গার নাম যা মদীনা থেকে চার দিনের দূরত্বে সমুদ্রের দিকে অবস্থিত। যেহেতু এটি অতর্কিত আক্রমণ ছিল তাই কাফেলার লোকেরা মুসলমানদের আক্রমণ সহ্য করতে পারেনি আর তারা তাদের জিনিসপত্র ফেলে পালিয়ে যায়। যায়েদ (রা.) কয়েকজন বন্দিকে আটক করেন এবংকাফেলার জিনিসপত্র নিজের করায়ত্তে নিয়ে মদীনার পথ ধরেন এবং মহানবী (সা.)-এর সকাশে উপস্থিত হন। ”

(সীরাত খাতামান্নবীঈন, পৃ: ৬৭০)

এসব ঘটনার মাঝে আবুল আ’স বিন রবী’র আটক হওয়া ও ইসলাম গ্রহণ করারও উল্লেখ পাওয়া যায়। এর বিশদ বিবরণ হলো, ইবনে ইসহাক বলেন, মক্কা বিজয়ের পূর্বে আবুল আ’স বিন রবী’ বাণিজ্যের উদ্দেশ্যে নিজের পণ্য এবং কুরাইশের লোকদের পণ্যসামগ্রী নিয়ে সিরিয়ার উদ্দেশ্যে যাত্রা করে। বাণিজ্য শেষে সে যখন কাফেলা নিয়ে ফেরত আসছিল তখন মহানবী (সা.)-এর একটি সৈন্যদলের সাথে তারা মুখোমুখি হয়। সাহাবীরা তাদের কাছে থাকা সমস্ত জিনিসপত্র নিজেদের করায়ত্তে নিয়ে নেয় এবং কাফেলার লোকদের বন্দি করেন।

ইবনে সা’দ লেখেন, হযরত যায়েদ (রা.) এই কাফেলাকে, যাদের মধ্যে আবুল আ’সও ছিল, আটক করেন এবং তাদেরকে মদীনায় নিয়ে আসেন। ইমাম যুহরী ও ইবনে উকবার মতে আবু বসীর, আবু জান্দাল এবং তাদের উভয়ের সঙ্গীরা আবুল আ’স-এর এই কাফেলার নিকট থেকে মালপত্রজব্দ করেন এবং তাদেরকে বন্দি করেন। তাদের গন্তব্যস্থল ছিল সীফুল বাহর। সীফুল বাহর-এর উল্লেখ পূর্বেও করা হয়েছে, এটি ঈস-এর নিকটস্থ সমুদ্র তীরবর্তী স্থান ছিল। তারা উভয়ে এ কাফেলার কাউকেই হত্যা করেন নি, কেননা মহানবী (সা.)-এর সাথে আবুল আ’স-এর শ্বশুরবাড়ির আত্মীয়তা ছিল; তিনি মহানবী (সা.)-এর জামাতা ছিলেন। একটি রেওয়ায়েতে বর্ণিত হয়েছে, আবুল আ’স অভিযানে অংশগ্রহণকারীদের হাত থেকে, অর্থাৎ যায়েদ বিন হারেসা (রা.)-র সৈন্যদের হাত থেকে পালিয়ে যায়। মুসলমানরা যখন এই কাফেলার ধনসম্পদ নিয়ে ফেরত আসে তখন আবুল আ’স রাতের বেলা মদীনায় আসে আর নিজের স্ত্রী রসুল-তনয়াহযরত যয়নব (রা.)-র নিকট গিয়ে আশ্রয় প্রার্থনা করে। হযরত যয়নব (রা.) আবুল আ’সকে আশ্রয় প্রদান করেন। মহানবী (সা.) যখন ফজরের নামায পড়ান তখন তিনি (সা.) তকবীর পাঠ করেন আর মানুষজনও তাঁর (সা.)সাথে তকবীর বলেন। হযরত যয়নব (রা.) তখন সুফ্‌ফাতুন নিসা, অর্থাৎ নারীদের জন্য নির্ধারিত যে স্থান ছিল সেখান থেকে উচ্চৈঃস্বরে বলেন; [আর অপর একটি রেওয়ায়েতে এসেছে, তিনি নিজের দরজায় দাঁড়িয়ে উচ্চকণ্ঠে বলেন,] হে লোকেরা! আমি আবুল আ’সকে আশ্রয় প্রদান করেছি। মহানবী (সা.) যখন সালাম ফেরান তখন তিনি (সা.) উপস্থিত লোকদের সম্বোধন করে বলেন, হে লোকসকল! তোমরা কি তা শুনেছো যা আমিও শুনেছি? তারা নিবেদন করেন, হ্যাঁ। তিনি (সা.) বলেন, সেই সত্তার কসম যাঁর হাতে মুহাম্মদ (সা.)-এর প্রাণ রয়েছে, আমি এই বিষয়ের কিছুই আমি জানতাম না। এ সম্পর্কে আমার পূর্বে জানা ছিল না। এখনই (হযরত) যয়নবের কাছ থেকে শুনেছি। এমনকি আমি তা শুনেছি যা তোমরাও শুনেছ। মুসলমানরা তাদের শত্রুর বিপক্ষে একজোট। তিনি (সা.) বলেন,

মুসলমানরা তাদের শত্রুর বিপক্ষে একজোট। তাদের নগণ্য ব্যক্তিও (কাউকে) আশ্রয় দিতে পারে।

আরেক রেওয়ায়েতে বর্ণিত হয়েছে, তিনি (সা.) বলেন,

আমরাও তাকে আশ্রয় দিয়েছি যাকে যয়নব আশ্রয় দিয়েছে। এরপর মহানবী (সা.) নিজ গৃহে প্রবেশ করলে হযরত যয়নবও মহানবী (সা.)-এর সাথে প্রবেশ করেন আর আবুল আ’স-এর কাছ থেকে যাকিছু কেড়ে নেওয়া হয়েছিল তা ফিরিয়ে দেবার দাবি করেন। তিনি (সা.) দাবি মেনে নেন এবং বলেন, হে আমার কন্যা! তাকে ভালোভাবে আপ্যায়ন করো, কিন্তু সে যেনো তোমার সাথে একান্তে মিলিত না হয়। নিঃসন্দেহে তুমি তার জন্য বৈধ নও, কেননা সে কাফির এবং তুমি মুসলমান। মহানবী (সা.) এই অভিযানে অংশগ্রহণকারীদের কাছে বার্তা প্রে রণ করেন। অর্থাৎ যারা আবুল আ’স-এর কাছ থেকে মালপত্র নিয়েছিলেন, তিনি (সা.) তাদেরকে বলেন, এই ব্যক্তি আমার (পরিবারের) অন্তর্ভুক্ত, যেমনটি তোমরা জানো। অর্থাৎ তার সাথে আমার আত্মীয়তা রয়েছে। আর তোমরা তার কাছ থেকে মালপত্র ছিনিয়ে নিয়েছ। যদি তোমরা অনুগ্রহ করো আর তার মালপত্র তাকে ফিরিয়ে দাও; [তিনি (সা.) নির্দেশ দেননি, (বরং) তিনি বলেন,] যদি তোমরা অনুগ্রহ করে তার মালপত্র তাকে ফিরিয়ে দাও তাহলে তাআমার ভালো লাগবে। আর যদি তোমরা অস্বীকার করো তাহলে এটি আল্লাহ্ তা’লার গনিমত, যা তিনি তোমাদের দান করেছেন। এতে আমার কোনো আপত্তি নেই আর তোমরাই এর অধিক অধিকার রাখো। তখন তারা বলেন, হে আল্লাহ্‌র রসুল (সা.)! আমরা এই মালপত্র তাকে ফিরিয়ে দিচ্ছি।

ইবনে উকবা লিখেছেন, আবুল আ’স হযরত যয়নব (রা.)-র সাথে নিজের সেসব সঙ্গীর বিষয়ে কথা বলে যাদেরকে আবু বসীর এবং আবু জান্দাল বন্দি করেছিলেন আর তাদের কাছ থেকে মালপত্র ছিনিয়ে নিয়েছিলেন। হযরত যয়নব আল্লাহ্‌র রসুল (সা.)-এর সাথে এ ব্যাপারে কথা বলেন। মহানবী (সা.) আগমন করেন আর লোকদের উদ্দেশ্যে বক্তব্য প্রদান করেন। তিনি(সা.) বলেন, আমি কয়েকজনকে জামাতা বানিয়েছি। আর আমি আবুল আ’সকেও জামাতা বানিয়েছি এবং তাকে আমি উত্তম জামাতা হিসেবে পেয়েছি। সে সিরিয়া থেকে নিজের

যুগ ইমামের বাণী

সেই সময় দূর নয় বরং অতি নিকটেই যেদিন তোমরা আকাশ থেকে ফিরিশতাদের ফৌজ এশিয়া, ইউরোপ ও আমেরিকার মানুষের মনে অবতীর্ণ হতে দেখবে। (ফতেহ ইসলাম, রূ-খা, খণ্ড-৩, পৃ: ১২)

দোয়াপ্রার্থী: Saeen Mir and Family, Kogram, Nalhati (Birbhum)

কয়েকজন কুরাইশ সঙ্গীর সাথে ফিরে আসছিল। আবু জান্দাল এবং আবু বসীর তাদেরকে আটক করে আর তাদেরকে বন্দি করেছে। আর তাদের কাছে যাকিছু ছিল তা কেড়ে নিয়েছে এবং তাদের মধ্য থেকে কোনো একজনকেও হত্যা করেনি। আর যয়নব আমার কাছে অনুরোধ করেছে, আমি যেন তাকে আশ্রয় দিই। তোমরা কি আবুল আ'স এবং তার সঙ্গীদের আশ্রয় দিবে? তখন লোকেরা বলে, জি হ্যাঁ। যখন আবুল আ'স এবং তার বন্দি সঙ্গীদের ব্যাপারে মহানবী (সা.)-এর এই কথা আবু জান্দাল ও তার সঙ্গীদের কানে পৌঁছে তখন তারা সবাইকে মুক্ত করে দেন আর সকল জিনিসপত্র তাদেরকে ফেরত দিয়ে দেন, এমনকি রশিও ফেরত দেন। ইবনে ইসহাক এবং মুহাম্মদ বিন উমর-এর মতে সাহাবীরা তাদের সবকিছু ফিরিয়ে দেন। এমনকি কেউ বালতি নিয়ে আসে, কেউ মশক এবং কেউ বদনা নিয়ে আসে, কেউবা হাওদার কাঠ নিয়ে আসে। তারা বন্দিসহ সবকিছুই ফিরিয়ে দেন আর এর মধ্য থেকে কোনো জিনিসই হারায়নি।

এরপর আবুল আ'স মালপত্র নিয়ে মক্কা অভিমুখে চলে যায় আর প্রত্যেক পাওনাদারকে তার পাওনা বুঝিয়ে দেয়। এরপরদণ্ডায়মান হয়ে বলে, অর্থাৎ আবুল আ'স মক্কাবাসীদের সামনে বলে, হে মক্কাবাসী! তোমাদের মধ্য থেকে কোনো এক ব্যক্তিরও কোনো সম্পদ কি আমার কাছে বাকি আছে যা সে ফেরত নেয়নি? হে মক্কাবাসীরা! আমি কি আমার দায়িত্ব যথাযথভাবে পালন করেছি? তখন তারা সবাই বলে, হ্যাঁ। আল্লাহ্ তা'লা তোমাকে উত্তম প্রতিদান দিন; আমরা তোমাকে অতি উত্তম এবং বিশ্বস্ত পেয়েছি। তখন আবুল আ'স ইসলাম গ্রহণ করার ঘোষণা দিয়ে বলে, আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি, আল্লাহ্ তা'লা ছাড়া কোনো উপাস্য নেই আর মুহাম্মদ (সা.) আল্লাহ্‌র বান্দা এবং তাঁর রসুল। আল্লাহ্‌র কসম! মহানবী (সা.)-এর কাছে (থাকা অবস্থায়) কোনো কিছুই আমাকে ইসলাম গ্রহণ করা থেকে আটকাতে পারতো না। অর্থাৎ আমি যখন মদীনায় ছিলাম সেখানেও ইসলাম গ্রহণ করতে পারতাম; কিন্তু আমার ভয় হয়, পাছে তোমরা হয়ত ভাববে, আমি তোমাদের ধনসম্পদ গ্রাস করার পাঁয়তারা করছি। আল্লাহ্ তা'লা যখন এই ধনসম্পদ তোমাদের নিকট ফিরিয়ে দিলেন;[যে আমানত ছিল তা আমি তোমাদের ফিরিয়ে দিই এবং আমি এগুলোর দায়িত্ব থেকে মুক্তি পাই] তখন আমি ইসলাম গ্রহণ করি। অতঃপর (তিনি) সেখান থেকে যাত্রা করেন এবং মহানবী (সা.)-এর কাছে মদীনায় চলে আসেন।

(সুবুলুল হুদা ওয়ার রিশাদ, ৬ষ্ঠ খণ্ড, পৃ: ৮৩-৮৪) (আত্তাবাকাতুল কুবরা, লি ইবনে সাআদ, ২য় খণ্ড, পৃ: ৬৬) (ফারহাঙ্গে সীররাত, পৃ: ১৬০)

এ সম্পর্কে হযরত মির্যা বশীর আহমদ সাহেব (রা.) এভাবে লিখেছেন, ঈস-এর অভিযানে (আটককৃত) বন্দিদের মাঝে আবুল আ'স বিন রবী'ও ছিলেন যিনি মহানবী (সা.)-এর জামাতা ছিলেন এবং প্রয়াত হযরত খাদীজা (রা.)-র একজন নিকটাত্মীয় ছিলেন। ইতঃপূর্বে তিনি বদরের যুদ্ধেও বন্দি হয়ে এসেছিলেন, কিন্তু সে সময় মহানবী (সা.) এ শর্তে তাকে ছেড়ে দিয়েছিলেন যে, তিনি মক্কায় ফিরে গিয়ে তাঁর (সা.) কন্যা রসুল-তনয়া হযরত যয়নব (রা.)-কে মদীনায় পাঠিয়ে দেবেন। আবুল আ'স এ অঙ্গীকার পূর্ণ করেছিল বটে, কিন্তু সে নিজে তখনো শিরকের ওপর প্রতিষ্ঠিত ছিল বা পৌত্তলিকতায় বিশ্বাসী ছিল। যায়েদ বিন হারেসা (রা.) যখন তাকে বন্দি করে মদীনায় নিয়ে আসেন তখন রাত ছিল, কিন্তু কোনোভাবে আবুল আ'স হযরত যয়নব (রা.)-কে সংবাদ পাঠায় যে, আমি এভাবে বন্দি হয়ে এখানে এসে পৌঁছেছি, তুমি যদি আমার জন্য কিছু করতে পারো তবে করো। অতএব যখন মহানবী (সা.) এবং তাঁর সাহাবীরা ফজরের নামাযে ব্যস্ত ছিলেন ঠিক সেই সময় যয়নব (রা.) বাড়ির ভেতর থেকে উচ্চৈঃস্বরে ডেকে বলেন, হে মুসলমানেরা! আমি আবুল আ'স-কে আশ্রয় দিয়েছি। মহানবী (সা.)-এর নামায পড়া শেষ হলে সাহাবীদের দিকে ফিরে বলেন, যয়নব যা বলেছে তা কি আপনারা শুনেছেন? আল্লাহ্‌র কসম! আমি এ বিষয়ে কিছুই জানতাম না, কিন্তু মুমিনদের জামা'ত এক আত্মার মতো বা এক দেহের বৈশিষ্ট্য রাখে। তাদের মধ্য হতে কেউ যদি কোনো কাফিরকে আশ্রয় প্রদান করে তবে তার সম্মান করা আবশ্যক। অতঃপর তিনি (সা.) যয়নবের দিকে তাকিয়ে বলেন,

"তুমি যাকে আশ্রয় দিয়েছ, আমরাও তাকে আশ্রয় দিয়েছি। আর এই অভিযানে আবুল আ'স-এর কাছ থেকে যে ধনসম্পদ হস্তগত হয়েছিল তা তাকে ফিরিয়ে দেওয়া হয়। অতঃপর তিনি (সা.) বাড়ি আসেন এবং নিজের কন্যা যয়নব (রা.)-কে বলেন, ভালোভাবে আবুল আ'স-এর আদর-আপ্যায়ন করো, কিন্তু তার সাথে নিভৃতে মিলিত হয়ো না, কেননা এহেন অবস্থায় তার সাথে তোমার মিলিত হওয়া বৈধ নয়। কয়েক দিন মদীনায় অবস্থান করে আবুল আ'স মক্কা অভিমুখে ফেরত চলে যায়, কিন্তু তার এবারকার মক্কায় যাওয়াসেখানে অবস্থানের উদ্দেশ্যে ছিল না, কেননা তিনি অতি শীঘ্রই নিজের দেনাপাওনা মিটিয়ে কলেমা শাহাদত পড়তে পড়তে মদীনার উদ্দেশ্যে যাত্রা করেন আর মহানবী (সা.)-এর সমীপে উপস্থিত হয়ে মুসলমান হয়ে যান। এরপর তিনি (সা.) হযরত যয়নব (রা.)-কে পুনরায় কোনো বিয়ে ছাড়াই তার কাছে ফেরত পাঠান। অর্থাৎ এ পর্যায়ে তাকে অনুমতি দিয়ে দেন যে, তিনি স্ত্রী হিসেবে (তার সাথে) থাকতে পারেন। কোনো কোনো রেওয়ায়েতে এটিও বর্ণিত হয়েছে, সে সময় হযরত যয়নব (রা.) এবং আবুল আ'স-এর পুনরায় বিয়ে পড়ানো হয়েছিল, কিন্তু প্রথম রেওয়ায়েত অধিক নির্ভরযোগ্য এবং সঠিক।"

(সীরাত খাতামান্নবীঈন, পৃ: ৬৭০-৬৭১)

হযরত আবুল আ'স (রা.)-র ব্যাবসাবাণিজ্য মক্কায় ছিল, এজন্য তিনি মদীনায় অবস্থান করতে পারতেন না। কাজেই ইসলাম গ্রহণের পর তিনি মহানবী (সা.)-এর অনুমতিক্রমে পুনরায় মক্কায় ফিরে আসেন। মক্কায় অবস্থানের কারণে তিনি বিভিন্ন যুদ্ধে অংশগ্রহণ করতে পারেন নি, কেবল দশম হিজরীতে হযরত আলী (রা.)-র নেতৃত্বে প্রেরিতএকটি যুদ্ধাভিযানে তিনি অংশগ্রহণ করেছিলেন। হযরত আলী(রা.) ইয়েমেন থেকে ফেরত আসার সময় তাকে ইয়েমেনের গভর্নর নিযুক্ত করেছিলেন। অষ্টম হিজরীতে হযরত যয়নব (রা.)-র ইন্তেকালের পর আবুল আ'স (রা.)-ও আর বেশিদিন জীবিত ছিলেন না এবং দ্বাদশ হিজরীতে তিনি মৃত্যুবরণ করেন।

(সীরাতু সাহাবা, ৪র্থ খণ্ড, পৃ: ৪৯১) (উসদুল গাবা, ৬ষ্ঠ খণ্ড, পৃ: ১৮২-১৮৩) (উসদুল গাবা, ৭ম খণ্ড, পৃ: ১৩২)

এরপর একটি যুদ্ধাভিযানের বর্ণনা পাওয়া যায় যেটিকে বনু লাহইয়ান-এর যুদ্ধ বলা হয়। এর নাম লিহইয়ান এবং লাহইয়ান দুভাবেই বর্ণিত হয়েছে।

(সীরাত খাতামান্নবীঈন, পৃ:৬৭৭)

বনু লাহইয়ান ছিল বনু হুযাইল গোত্রের একটি শাখা। মক্কা থেকে তিন মারহালা দূরত্বে আসফান উপত্যকা ছিল যার উত্তর-পূর্বদিকে পাঁচ মাইল দূরত্বে অবস্থিত গুরান উপত্যকায় বনু লাহইয়ান বসবাস করতো।

(সূত্র: সুবুলুল হুদা ওয়ার রিশাদ, ৬ষ্ঠ খণ্ড, পৃ: ৩০) (ফারহাঙ্গে সীরাত, পৃ: ২০০,২১৯)

বনু লাহইয়ান-এর যুদ্ধ সম্পর্কে এই মতভেদ রয়েছে যে, এটি কোন সালে এবং কোন মাসে সংঘটিত হয়েছে।

আল্লামা ইবনে সা'দ-এর মতে, এই যুদ্ধাভিযান ষষ্ঠ হিজরী সনের রবিউল আউয়াল মাসের একেবারে প্রারম্ভে সংঘটিত হয়েছে। মুহাম্মদ বিন উমরের মতে ষষ্ঠ হিজরী সনের রজব মাসে এবং আল্লামা ইবনে ইসহাকের মতে এই যুদ্ধাভিযান বনু কুরায়যার যুদ্ধের ছয় মাস পরে ষষ্ঠ হিজরী সনের জমাদিউল উলা মাসে সংঘটিত হয়েছে। আল্লামা হাকেম এটিকে শাবান মাসের যুদ্ধাভিযান লিখেছেন। আল্লামা ইবনে হাযম এটিকে পঞ্চম হিজরী সনের, আল্লামা যাহবী ষষ্ঠ হিজরী সনের এবং কতক জীবনীকার এটিকে চতুর্থ হিজরী সনের যুদ্ধাভিযান লিখেছেন।

(সুবুলুল হুদা ওয়ার রিশাদ, ৬ষ্ঠ খণ্ড, পৃ: ৩০,৩১) (সীরাতুন নবী, লি ইবনে হিশাম, পৃ: ৬৬৩)

হযরত মির্যা বশীর আহমদ সাহেব যে সিদ্ধান্তে উপনীত হয়েছেন তদনুসারে তিনি এটিকে ৬২৭ খ্রিষ্টাব্দের সেপ্টেম্বর মাস অনুযায়ী ষষ্ঠ হিজরী সনের জমাদিউল উলা মাসের যুদ্ধ লিখেছেন। তিনি লেখেন,

"বনু লাহইয়ানের যুদ্ধের ইতিহাস সম্পর্কে ঐতিহাসিকদের মাঝে মতভেদ রয়েছে। ইবনে সা'দ এটিকে ষষ্ঠ হিজরী সনের রবিউল আউয়াল মাসের ঘটনা বলে উল্লেখ করেছেন, কিন্তু ইবনে ইসহাক এবং তাবারী ব্যাখ্যা করেছেন যে, এটি ষষ্ঠ হিজরী সনের জমাদিউল উলা মাসে সংঘটিত হয়েছে। তিনি

যুগ ইমামের বাণী

তোমাদের আদর্শ তারা যাদের সম্পর্কে আল্লাহ্ তা'লা বলেন, কোনও ব্যবসা বা কেনাবেচা তাদেরকে আল্লাহ্‌র স্মরণ থেকে বিরত রাখে না।"

(মালফুযাত, ৫ম খণ্ড, পৃ: ৯৬)

দোয়াপ্রার্থী: Jahan ara Begum, Bhagwangola, Murshdabad

যুগ খলীফার বাণী

জাগতিক কামন-বাসনা শিরকের অন্তর্ভুক্ত। এটি এড়িয়ে চলা আবশ্যক।

(খুতবা জুমআ, ২৪ শে মে, ২০১৯)

দোয়াপ্রার্থী: Abdus Salam Master, Nararvita (Assam)

(রা.) বলেন, আমি এ স্থলে ইবনে ইসহাকের অনুসরণ করেছি, অর্থাৎ তাঁর মতে তিনি সঠিক। প্রকৃত বিষয় আল্লাহ্ তা'লাই ভালো জানেন।"

(সীরাত খাতামান্নবীঈন, পৃ: ৬৭৪,৬৭৬)

বনু লাহইয়ানের প্রেক্ষাপট সম্পর্কে হযরত মির্যা বশীর আহমদ সাহেব রাজী-র সাহাবীদের মর্মান্তিক ঘটনার উদ্ধৃতি দিয়ে বর্ণনা করেন:

"সেই ঘটনায় দশজন নিষ্পাপ মুসলমানকে, যাদেরকে ইসলামের শান্তিপূর্ণ প্রচারের কাজে প্রেরণ করা হয়েছিল, অত্যন্ত নির্দয়ভাবে এবং প্রতারণার মাধ্যমে হত্যা করা হয়েছিল আর এই পুরো ষড়যন্ত্রের মূলে বনু লাহইয়ানের হাত ছিল, যারা সেই যুগে মক্কা এবং মদীনার মাঝখানে গুরান উপত্যকায় বসবাস করত। স্বভাবতই মহানবী (সা.) এই ঘটনায় অত্যন্ত মর্মাহত ছিলেন। আর যেহেতু বনু লাহইয়ানের আচরণ তখনও একইরকম শত্রুতামূলক এবং ষড়যন্ত্রমূলক ছিল আর তাদের পক্ষ থেকেআগামীতেও এই আশঙ্কা ছিল যে, তারা মুসলমানদের বিরুদ্ধে নতুন কোনো উস্কানির কারণ হতে পারে,তাই তিনি (সা.) কৌশলগত দিক থেকেতাদের ক্ষেত্রে কিছুটা সতর্কতা অবলম্বন করা সমীচীন মনে করেছেন যেন অন্ততপক্ষে ভবিষ্যতের জন্য মুসলমানরা তাদের ষড়যন্ত্র থেকে নিরাপদ হয়ে যায়। "

(সীরাত খাতামান্নবীঈন, পৃ: ৬৭৪,৬৭৬)

এজন্য মহানবী (সা.) এই সতর্কতামূলক অভিযানের জন্য স্বয়ং রওয়ানা হন আর ইবনে মাকতুম (রা.)-কে নিজের স্থলাভিষিক্ত নিযুক্ত করেন।

মহানবী (সা.) তাঁর সাথে দুইশত সাহাবী এবং বিশটি ঘোড়া নিয়ে মদীনার উত্তরদিকে সিরিয়ার পথ ধরে যাত্রা করেন, অথচ বনু লাহইয়ান মদীনার দক্ষিণ দিকে হেজাযে মক্কার পথের নিকটে বসবাস করত। উত্তরদিকে যাবার কারণ ছিল, তিনি (সা.) বনু লাহইয়ানের ওপর তাদের অজ্ঞাতসারে অতর্কিত আক্রমণ করতে চাচ্ছিলেন, যেন তারা আক্রমণের সংবাদ পেয়ে কোথাও পালিয়ে না যায়। এই উদ্দেশ্যেই তিনি (সা.) এমন রাস্তা ব্যবহার করেনযা সচরাচর ব্যবহার করা হতো না, আর দ্রুততার সাথে সফর করে বনু লাহইয়ানের বসতি গুরান-এ পৌঁছে যান, যেখানে তাঁর (সা.) সাহাবীরা শহীদ হয়েছিলেন। তিনি (সা.)তাঁর শহীদ সাহাবীদের জন্য রহমতের দোয়া করেন। বনু লাহইয়ান যখন তাঁর (সা.) আগমনের কথা জানতে পারে তখন তারা পাহাড়ের চূড়ায় পালিয়ে যায়। তাই তাদের কেউই ধরা পড়েনি।

(সূত্র: সুবুলুল হুদা ওয়ার রিশাদ, ৬ষ্ঠ খণ্ড, পৃ: ৩০) (আর রাহীকুল মাখতুম, পৃ: ২৮৪)

তিনি (সা.) একদিন অথবা দুই দিন সেখানে অবস্থান করেন আর সকল দিকে সেনাদল প্রেরণ করেন, কিন্তু তা সত্ত্বেও কেউ ধরা পড়েনি। তিনি (সা.) গন্তব্যস্থলে পৌঁছে সেখানে কিছুক্ষণ অবস্থান করেন।

আর এটিও বর্ণিত হয়েছে যে, এই সফরে তিনি (সা.) যখন সেই স্থানে পৌঁছেন যেখানে তাঁর (সা.) সাহাবীদেরকে শহীদ করা হয়েছিল তখন তিনি (সা.) ভীষণ আবেগাপ্লুত হয়ে পড়েন এবং পরম অনুনয়-বিনয়ের সাথে সেই সমস্ত শহীদের জন্য দোয়া করেন।"

(সীরাত খাতামান্নবীঈন, পৃ: ৬৭৫)

তিনি (রা.)আরো লেখেন, যখন বনু লাহইয়ানের ওপর অতর্কিত আক্রমণের পরিকল্পনা তাদের পাহাড়ের চূড়ায় পালিয়ে যাবার কারণে সফল হলো না, তখন তিনি(সা.) উসফান পর্যন্ত যান যেন মক্কাবাসীরা মনে করে যে, তিনি(সা.) মক্কায় যাবেন। অতএব তিনি (সা.) তাঁর সাহাবীদের সাথে নিয়ে উসফান গিয়ে পৌঁছেন। ইবনে ইসহাকের মতে এরপর তিনি (সা.) দুইজন অশ্বারোহী প্রেরণ করেন আর ইবনে সা'দের মতে তিনি (সা.) হযরত আবু বকরকে দশজন অশ্বারোহীসহ প্রেরণ করেন যেন কুরাইশ তাদের সম্পর্কে জানতে পারে এবং তাদের বিষয়ে ভীতসন্ত্রস্ত হয়। হযরত আবু বকর (রা.)কুরাউল গামীম পর্যন্ত যান, যেটি উসফান থেকে আট মাইল দূরত্বে অবস্থিত একটি উপত্যকা। এরপর হযরত আবু বকর (রা.)(পুনরায়) উসফান ফেরত আসেন, আরকারো সাথে তাদের মোকাবিলা হয়নি। অতঃপর আল্লাহর রসুল (সা.) মদীনায় ফিরতি যাত্রা আরম্ভ করেন আর চৌদ্দ দিন বাইরে অবস্থানের পর ফেরত আসেন। (সূত্র: সুবুলুল হুদা ওয়ার রিশাদ, ৬ষ্ঠ খণ্ড, পৃ: ৩০) (ফারহাঙ্গে সীরাত, পৃ: ২৪৩)

হযরত মির্যা বশীর আহমদ সাহেব লেখেন, ফিরতি যাত্রার সময় তিনি (সা.) একটি দোয়া করেন যা পরবর্তীতে মুসলমানরা নিজেদের গুরুত্বপূর্ণ সফর থেকে প্রত্যাবর্তনকালে সাধারণত পাঠ করত আর সেই দোয়াটি হলো, آيِبُوْنَ تَائِبُوْنَ عَابِدُوْنَ سَاجِدُوْنَ لِرَبِّنَا حَامِدُوْنَ অর্থাৎ,আমরা আমাদের খোদা তা'লার দিকে প্রত্যাবর্তনকারী, তাঁরই সমীপে বিনত হই, তাঁরই ইবাদতকারী, তাঁরই দরবারে সিজদাকারী এবং আমাদের প্রভুর গুণকীর্তনকারী।"

মহানবী (সা.) নিজেও তাঁর পরবর্তী সফরগুলোতে সাধারণত এ দোয়া পাঠ করতেন আর কখনো কখনো এর সাথে এই শব্দাবলি যুক্ত করতেন-

صَدَقَ اللّٰهُ وَعْدَهٗ وَنَصَرَ عَبْدَهٗ وَهَزَمَ الْأَحْزَابَ وَحْدَهٗ-

অর্থাৎ "আমাদের খোদা স্বীয় প্রতিশ্রুতি পূর্ণ করেছেন এবং নিজ বান্দাকে সাহায্য করেছেন আর শত্রুদলকে স্বয়ং নিজ শক্তিবলে পশ্চাৎপদ করেছেন।"

এই দোয়া, যা বনু লাহইয়ানের যুদ্ধাভিযানের বরাতে জীবনীকারগণ বর্ণনা করেছেন আর হাদীস বিশারদগণও যার সত্যায়ন করেছেন, নিজের মাঝে এক বিশেষ গুরুত্ব বহন করে। আর এটি পাঠের মাধ্যমে সেই আবেগ-অনুভূতির বিষয়টি অনুমান করার সুযোগ লাভ হয় যা সেই অরাজকতাপূর্ণ যুগে মহানবী (সা.)-এর, (যাঁর জন্য আমার প্রাণ উৎসর্গিত,) তাঁর পবিত্র হৃদয়ে তরঙ্গায়িত হচ্ছিল এবং যা মহানবী(সা.) স্বীয় সাহাবীদের হৃদয়ে সৃষ্টি করতে চেয়েছিলেন।

এ দোয়ায় এই ব্যাকুলতা সুপ্ত রয়েছে যে, শত্রুদের পক্ষ থেকে যে প্রতিবন্ধকতা মুসলমানদের ইবাদত বন্দেগী এবং ইসলামের শান্তিপূর্ণ তবলীগের পথে সৃষ্টি করা হচ্ছে, আল্লাহ্ তা'লা তা দূর করুন;আর আল্লাহ্ তা'লা সেই প্রতিবন্ধকতা যতটুকু দূর করেছেন, তার জন্য কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করা হয়েছে।

এর দৃষ্টান্ত এরূপ যেভাবে এক ব্যক্তি তার খুব পছন্দের কোনো কাজে মগ্ন থাকে আর হঠাৎ অন্য কোনো ব্যক্তি তার কাজে ব্যাঘাত ঘটিয়ে তার মনোযোগে বিঘ্ন ঘটায়, কিন্তু কিছু সময় পর খোদার কৃপায় এ প্রতিবন্ধকতা দূর হয়ে যায় আর সেই ব্যক্তি পুনরায় তার পছন্দনীয় কাজে মগ্ন হওয়ার সুযোগ লাভ করে। এহেন পরিস্থিতিতে যে আবেগ সেই ব্যক্তির হৃদয়ে সৃষ্টি হবে তা-ই এ দোয়ায় সুপ্ত রয়েছে, কেননা মহানবী (সা.) বলেন,

আমরা এ সফরের সাময়িক প্রতিবন্ধকতা থেকে মুক্ত হয়ে পুনরায় সেই পরিস্থিতির দিকে ফেরত আসছি যাতে আমরা আমাদের খোদার স্মরণে সময় অতিবাহিত করতে পারব এবং তাঁর প্রশংসা ও গুণকীর্তন করার সুযোগ লাভ করব। হ্যাঁ, সেই খোদা, যিনি এর পূর্বেও অসংখ্য বার আমাদেরকে শত্রুর নৈরাজ্য থেকে সুরক্ষিত করে নিরাপত্তা প্রদান করেছেন। এই অনুভূতি কতই না কল্যাণমণ্ডিত আর কতই না মনোমুগ্ধকর আর কতই নাশান্তিপূর্ণ!

কিন্তু হায় পরিতাপ! এতৎসত্ত্বেও কতিপয় ইসলামবিদ্বেষী আপত্তি উত্থাপন করা থেকে বিরত হয় না আর এটিই বলতে থাকে যে, মহানবী (সা.) এবং তাঁর সাহাবীদের মূল উদ্দেশ্য ছিল আগ্রাসী সেনা অভিযান এবং পার্থিব লালসা (নাউযুবিল্লাহ্)। " (সীরাত খাতামান্নবীঈন, পৃ: ৬৭৫-৬৭৬)

এরপর আরো একটি অভিযান তথাযায়েদ বিন হারেসার অভিযান রয়েছে। এই অভিযান ষষ্ঠ হিজরী সনের জমাদিউস সানী মাসে সংঘটিত হয়। মহানবী (সা.) হযরত যায়েদ বিন হারেসা (রা.)-কে বনু সালাবা বিন সা'দ গোত্র অভিমুখে তারেফ নামক স্থানে প্রেরণ করেন। তারেফ বনু সালাবার একটি কূপের নাম যা ইরাকযাবার পথেমদীনা থেকে ছত্রিশ মাইল দূরে অবস্থিত। হযরত যায়েদ বিন হারেসা (রা.) পনেরোজন লোকসহ বের হন আর যখন তারেফ পৌঁছেন তখন সেখানকার উট এবং বকরিগুলো হস্তগত করেন। তখন সেখানে উপস্থিত বেদুইনরা এই ভেবে ভয় পায় যে, মহানবী (সা.) তাদের দিকে আসছেন আর তারা সেখান থেকে পালিয়ে যায়। হযরত যায়েদ বিন হারেসা

(রা.)গবাদিপশুগুলো হাঁকিয়েমদীনা নিয়ে আসেন। বনু সালাবার লোকেরা সেসব সাহাবীর খোঁজে বের হয়, কিন্তু তারা সাহাবীদের নাগাল পায়নি। সাহাবীরা মোট বিশটি উট নিয়ে আসেন। তারা এই অভিযানের জন্য চার রাত (মদীনার) বাহিরেছিলেন, কিন্তু কোনো যুদ্ধ সংঘটিত হয়নি। এই অভিযানে মুসলমানদের রণসংগীত ছিল- আমিত, আমিত।

(সুবুলুল হুদা ওয়ার রিশাদ, ৬ষ্ঠ খণ্ড, পৃ: ৮৭)

মহানবী (সা.)-এর বাণী

আঁ হযরত (সা.) বলেছেন: যে ব্যক্তি কুরআন পড়ে এবং অনুধাবন করে, সে ধনী; তার কোনও দারিদ্রের ভয় নেই।

(সুনান সাঈদ বিন মনসুর)

দোয়াপ্রার্থী: Wasia Begum, Harhari, Murshidabad

যুগ খলীফার বাণী

খিলাফত এবং জামাতের সঙ্গে যারা সম্পর্ক স্থাপন করে, আল্লাহ তা'লা তাদের পথ-প্রদর্শন করেন।

-খুতবা জমা ২৪ মে ২০১৯

দোয়াপ্রার্থী: Noo Jahan Begum, Kolkata

বাকি পরবর্তীতে বর্ণনা করা হবে, ইনশাআল্লাহ্।

বর্তমানে পৃথিবীর অবস্থা সম্পর্কে কমবেশি সবাই জানে। সিরিয়ায় উদ্ভূত পরিস্থিতি এখনও স্পষ্ট নয়।

যদিও বলা হচ্ছে, এক অত্যাচারী স্বৈরশাসকের পতন হয়েছে, কিন্তু দোয়া করুন যেন ভবিষ্যতে আগমনকারী সরকার ন্যায়পরায়ণ হয়।যারা ক্ষমতায় আসে তারা সবাই দাবি করে, আমরা ন্যায়বিচার করব; কিন্তু সাধারণত এটিই দেখা গেছে যে, যখন ক্ষমতা লাভ হয় তখন তাদের কথার সাথে কাজের মিল থাকে না। আল্লাহ্ তা'লা এই এলাকার আহমদীদের নিজ সুরক্ষায় রাখুন।

বিশ্লেষকরা লিখেছেন,অত্যাচার শেষ হওয়ায় বাহ্যত মানুষ আনন্দ উদ্‌যাপন করছে, কিন্তু ভবিষ্যতে কী হবে- তার কোনো নিশ্চয়তা নেই। এছাড়া অকারণে ইসরাঈলও এসব এলাকায় আক্রমণ করছে।

বাহ্যত মুসলিম-অধ্যুষিত দেশগুলোর বিরুদ্ধে তাদের উদ্দেশ্য ভয়ানক বলে মনে হচ্ছে। আর এই দৃষ্টিকোণ থেকে কোনো দেশই নিরাপদ নয়। এই প্রেক্ষিতে পাকিস্তানের জন্যও দোয়া করুন, ইরানসহ অন্যান্য দেশের জন্যও দোয়া করুন। আল্লাহ্ তা'লা মুসলমানদের বিবেক ও চেতনাবোধ দান করুন। আর তাদের মাঝে থাকা দলাদলি ও ক্ষমতা লাভের লালসা যেন দূর হয়ে যায় আর তারা যেন ঐক্যবদ্ধ হয়ে যায়।

যদি মুসলমানদের পক্ষ থেকে এমন আচরণ অব্যাহত থাকে তাহলে এমন অত্যাচারীদেরকে আল্লাহ্ তা'লা কীভাবে সাহায্য করবেন যারা নিজেদের লোকদেরকেই হত্যা করছে? যাহোক, অনেক দোয়া করুন।

আল্লাহ্‌তা'লা সকল আহমদীকে তাদের অনিষ্ট থেকে সুরক্ষিত রাখুন। আহমদীরা এসব নামসর্বস্ব মুসলমানের হাতেও নিরাপদ নয়,আরমুসলিম-বিরোধী অমুসলিমদের হাতেও নিরাপদ নয়। আল্লাহ্ তা'লা দয়া করুন এবং আমাদেরকে সকলক্ষেত্রে স্বীয় নিরাপত্তায় সুরক্ষিত রাখুন।

একইসাথে সাম্প্রতিক সময়ে পৃথিবীতে অসংখ্য ঘূর্ণিঝড় হচ্ছে। কিছুদিন পূর্বে মায়োটে ঘূর্ণিঝড় হয়েছিল। সেখানেও আহমদীরা রয়েছে। আল্লাহ্ তা'লার অনুগ্রহে তারা নিরাপদে আছেন। আর জামা'তও সেখানে সেবা করছে আর সেখানকার সরকারও এসব কাজের প্রশংসা করেছে। আর যেখানে লোকেরা খাবার চড়া দামে বিক্রি করছে, ক্ষুধার্তরা খাবার পাচ্ছে না, সেখানে জামা'ত আল্লাহ্ তা'লার কৃপায় সেবাদান করছে এবং খাবার খাওয়াচ্ছে। কিন্তু যাহোক, দোয়া করুন যেন আল্লাহ্‌তা'লা এসব উপদ্বীপকে ঐশী বিপদাপদ থেকে সুরক্ষিত রাখেন।

এছাড়া আমি নামাযের পর জানাযাও পড়াবো। প্রথম জানাযা শহীদ আমীর হাসান ওরানী সাহেবের। তিনি মীরপুর জেলার নুসরাতাবাদের দুররে মুহাম্মদ সাহেবের পুত্র ছিলেন। কিছুদিন পূর্বে তাকে শহীদ করা হয়েছে, ইন্নালিল্লাহি ওয়া ইন্না ইলাইহি রাজেউন। তিনি মসজিদ থেকে ঘরে ফিরছিলেন, পথিমধ্যে তাকে গুলি করে শহীদ করা হয়। মরহুম ওসিয়্যতকারী ছিলেন। তার শোকসন্তপ্ত পরিবারে তার মা, সহধর্মিণী, দুই ছেলে ও তিন কন্যা রয়েছে। ভাই বোনও আছে।

ঘটনার বিস্তারিত বর্ণনা হলো, আমীর হাসান সাহেব ১৩ ডিসেম্বর তারিখ ভোরে তাহাজ্জুদ ও ফজরের নামায বাজামা'তআদায়ের পর নিজের বাড়ি ফিরছিলেন। তার বারো বছর বয়সী পুত্র স্নেহের তৈমুরও তার সাথে ছিল। তার বাড়ি এবং মসজিদের মাঝে একটি সড়ক রয়েছে। তারা সড়ক অতিক্রম করা মাত্রই দুইজন অজ্ঞাতনামা মোটর সাইকেল আরোহী, যারা পূর্ব থেকেই সেখানে উপস্থিত ছিলো, নিজেদের চেহারা ঢেকে তার নিকটে এসে নাম জিজ্ঞেস করে, আর সনাক্ত করার পর গুলি করে। শহীদ মরহুমের দেহে পাঁচটি গুলি লাগে যার ফলে তিনি ঘটনাস্থলেই শহীদ হয়ে যান, ইন্নালিল্লাহি ওয়া ইন্না ইলাইহি রাজেউন । এরপর আক্রমণকারীরা ঘটনাস্থল থেকে পালিয়ে যায়। তার পুত্র স্নেহের তৈমুরকে আল্লাহ্ তা'লা অলৌকিকভাবে নিরাপদ রেখেছেন। এরপর তার পুত্র অসাধারণ সাহস ও অবিচলতার পরিচয় দিয়ে জামা'তের সদস্যদের ঘটনা সম্পর্কে অবহিত করে।

মরহুমের বংশে আহমদীয়াতের সূচনা তার প্রপিতামহ মুকাররম ধনি বখশ সাহবের মাধ্যমে হয়েছিল, যিনি ১৯৩৭ সালে দ্বিতীয় খিলাফতের যুগে বয়আত গ্রহণ করেন। শহীদ মরহুমের দাদা আহমদী ছিলেন না। কিন্তু পরিবারের অন্য সদস্যরা, অর্থাৎ চাচারা আহমদীয়াত গ্রহণ করেছিল। শহীদ মরহুমের পিতা দুররে মুহাম্মদ সাহেব দ্বিতীয় খিলাফতের যুগে ১৯৬৪ সালে বয়আত গ্রহণ করেছিলেন মুকাররম সৈয়্যদ দাউদ মুজাফফর শাহ সাহেবের মাধ্যমে, যিনি সেই দিনগুলোতে সেখানে ছিলেন এবং কৃষিকাজ করতেন। শহীদ (মরহুম) কৃষিকাজ করতেন আর কিছুদিন যাবৎ নুসরতাবাদে নিরাপত্তা প্রহরী হিসেবেও ডিউটি দিচ্ছিলেন। মরহুম মজলিস খোদ্দামুল আহমদীয়ার কায়েদ হিসেবে সেবা করার সৌভাগ্য লাভ করেছেন এবং শাহাদাতের সময় সেক্রেটারি ওয়াকফে নও হিসেবে সেবা করছিলেন। খিলাফতের সাথে নিষ্ঠা ও বিশ্বস্ততার গভীর সম্পর্ক ছিল তার। অতিথিপরায়ণ ছিলেন, নম্র স্বভাবের অধিকারী ছিলেন। তার মা বলেন, আমাদের জন্য এটি অনেক বড়ো সৌভাগ্য যে, আমার পুত্র শাহাদাতের মর্যাদা লাভ করেছে। জামা'তের জন্য আমার অন্য পুত্রের কুরবানি দিতে হলেও আমি প্রস্তুত আছি। অত্যন্ত সাহসী এক মা তিনি। তার পিতার মৃত্যুর পর সব সময় ভাইবোনদের খেয়াল রাখতেন। কোনো সাহায্যপ্রার্থীকে খালি হাতে ফিরিয়ে দিতেন না। প্রতিবেশীদের মাঝে অ-আহমদীএক অন্ধ মহিলা ছিল। তার ছাগপালের এবং তার সন্তানদের দেখাশোনা করতেন। তার সন্তানদের স্কুলে নিয়ে যেতেন। বাজামা'ত নামাযে খুবই নিয়মিত ছিলেন।

মীরপুরখাস জেলার আমীর সাহেব লেখেন, প্রত্যেক জামা'তী অনুষ্ঠানের জন্য সব কাজ ফেলে ডিউটিতে উপস্থিত হয়ে যেতেন। গত একমাস যাবৎ মরহুমের মাঝে আমি স্পষ্ট পরিবর্তন লক্ষ্য করেছি যে, ফজরের পূর্বে এসে মসজিদ খোলা, নফল আদায় করা দৈনন্দিন অভ্যাস ছিল। এমন মনে হতো যেন এক নতুন আমীর হাসান জন্ম নিয়েছে।

তার আত্মীয় জামেয়ার শিক্ষক খালেদ বেলুচ লেখেন, তার গুণাবলির মাঝে সাহসিকতা ও অন্যদের উপকারে আসার গুণ অনেক বেশি ছিল। যখনই তার সাথে সাক্ষাৎ হতো সর্বদা আধ্যাত্মিক বিষয়াদি নিয়ে আলোচনা করতেন। অধিকাংশ সময় খোদা এবং বান্দার সম্পর্ক কীভাবে উন্নত করা যায় সেই বিষয়ে কথা বলতেন।

আরেকজন মুরব্বী সাহেব লিখেন, আমাদের এলাকায় অ-আহমদীদের সাথেও তাঁর বেশ ভালো সম্পর্ক ছিল। তার মৃত্যুতে দূর দূরান্ত থেকে লোকেরা শোক প্রকাশ করার জন্য আসে এবং সবারই এই বক্তব্য ছিল যে, তিনি সবার সাথে ভালোবাসা রাখে এমন ব্যক্তি ছিলেন, প্রত্যেকের বিপদের সাথি ছিলেন। আল্লাহ্ তা'লা তার সাথে ক্ষমা ও দয়ার আচরণ করুন। তার পদমর্যাদা উন্নীত করুন। তার সন্তানদের নিজ নিরাপত্তায় রাখুন।

দ্বিতীয় জানাযা মালয়েশিয়া জামা'তের মুবাল্লেগ মুকাররম মওলানা আব্দুস সাত্তার রউফ সাহেবের।

তিনিও কিছুদিন পূর্বে পঁচাত্তর বছর বয়সে মৃত্যুবরণকরেন, ইন্নালিল্লাহি ওয়া ইন্না ইলাইহি রাজেউন। তিনি ১৫ জানুয়ারি ১৯৭৩ সনে আহমদীয়াত গ্রহণ করার সৌভাগ্য লাভ করেন। ১৯৭৭ সালের অক্টোবরে জামেয়া আহমদীয়া রাবওয়ায় ভর্তি হন; মুবাশ্বের কোর্স সম্পন্ন করেন। বিভিন্ন দেশে সেবা করার সুযোগ পেয়েছেন। ১৯৮৫ সালে মুবাল্লেগ হিসেবে ইন্দোনেশিয়ায় তার পদায়ন হয়। এরপর তাকে ফিজিতে পাঠানোহয়। সেখানে কয়েক বছর ছিলেন। এরপর তিনি ইন্দোনেশিয়ায় চলে যান। অতঃপর তাকে মালয়েশিয়া পাঠানো হয়, সেখানে তবলীগ করেন। এরপর ভিয়েতনামে তার নিযুক্তি হয়,সেখানেও কয়েক বছর অবস্থান করেন। তারপর পুনরায় তিনি মালয়েশিয়া সেবা করার সৌভাগ্য পান। খুবই উত্তম সেবক ছিলেন। তার শোকসন্তপ্ত পরিবারে স্ত্রী, তিন পুত্র এবং এক কন্যা রয়েছে। তার পরিচিত ব্যক্তিরা লিখেছেন যে, মরহুমজামা'তের জন্য পরিপূর্ণরূপে উৎসর্গিত ছিলেন আর জামা'তের সদস্যদেরকেও কুরবানী এবং ওয়াকফের বিষয়ে উৎসাহ দিতেন। অত্যন্ত স্নেহপরায়ণ ছিলেন এবং সবার দুর্বলতা ঢেকে রাখতেন। তার তবলীগি চেষ্টা প্রচেষ্টায় বহু লোক জামা'তে অন্তর্ভুক্ত হওয়ার সৌভাগ্য পেয়েছে। মহানবী (সা.)-এর প্রতি তার ছিল অগাধ ভালোবাসা। যখনই মহানবী (সা.)-এর উল্লেখ করা হতোতার চোখে অশ্রু নেমে আসতো। ভিন্ন দেশে গিয়ে জামা'তের সেবা করার কথা বললে নিজ স্ত্রী-সন্তানকে পিছনে রেখে কোনো চিন্তা ছাড়াই চলে যেতেন। আর সর্বদা জামা'তের খাতিরে কুরবানীর জন্য প্রস্তুত থাকতেন। আল্লাহ্ তা'লা মরহুমের সাথে ক্ষমা ও দয়ার আচরণ করুন, তার মর্যাদা উন্নীত করুন, মরহুমের সন্তানদেরকেও তার পুণ্যসমূহ অব্যাহত রাখার তৌফিক দিন।(আমীন)

✿****✿****✿****✿

(আল ফযল ইন্টারন্যাশনাল, ৩রা জানুয়ারী, ২০২৫)

যুগ খলীফার বাণী

"জাতি সত্তা অর্জনের জন্য ঐক্য ও আনুগত্য অত্যন্ত জরুরী।" (খুতবা জুমআ, প্রদত্ত- ৫ ডিসেম্বর, ২০১৪)

দোয়াপ্রার্থী: Sk. Zakir Hossain Sb, Bankura (W.B)

আমরা যদি চাই যে, আল্লাহ তা'লার নৈকট্য অর্জিত হোক, আল্লাহ্ তা"লা আমাদের দোয়া গ্রহণ করুক, আমাদের হৃদয়ে আল্লাহ্ তা'লার ভালবাসা সৃষ্টি হোক, তবে এর জন্য আল্লাহ্ তা'লা একটি নীতি বর্ণনা করেছেন। তিনি বলেছেন এই সমস্ত বিষয় তোমরা তখনই অর্জন করতে পারবে যখন তোমরা রসুলুল্লাহ্ (সা.)-এর আদর্শ অনুযায়ী নিজেদের পরিচালিত করবে, এবং তাঁর আদর্শকে বোঝার জন্য, সেই আদর্শবলীর উপর অনুশীলন করার জন্য এটিও আল্লাহ্ তা'লার অপার অনুগ্রহ যে, তিনি সাহাবা (রা.) গণের মাধ্যমে সেই সকল আদর্শ আমাদের নিকট পৌঁছে দিয়েছেন যেগুলির উপর মহানবী (সা.) আমল করতেন। কিন্তু একথাও অনুধাবন করা আবশ্যক যে মহানবী (সা.) কেবল সেই সমস্ত কাজ করতেন এবং কথা বলতেন যেগুলি সম্পর্কে আল্লাহ্ তা'লা কুরআন মজীদে বর্ণনা করেছেন।

আঁ হযরত (সা.)-এর পবিত্র জীবন থেকে একত্ববাদ প্রতিষ্ঠা, ইবাদত প্রতিষ্ঠা, সত্যনিষ্ঠতা, বিনয়, বদান্যতা, কৃতজ্ঞতা, সন্তানের তরবীয়ত, শিক্ষা এবং প্রতিবেশীদের সঙ্গে সদাচারণ করা-ইত্যাদি বিষয়ে প্রাঞ্জল বর্ণনা। এই প্রসঙ্গে জামাতের সদস্যবর্গকে হুযুর (সা.)-এর আদর্শ গ্রহণ করার প্রতি নির্দেশ

খোদা করুক আমরা যেন কেবল মৌখিক দাবীর দ্বারা নয় বরং আঁ হযরত (সা.)-এর আদর্শের উপর প্রতিষ্ঠিত হয়ে সঠিক আমলকারী হই এবং তাঁর অনুগত হয়ে নিজেদের মুক্তির উপকরণ তৈরী করতে সক্ষম হই।

কাদিয়ানের দারুল আমানে জামাত আহমদীয়ার আন্তর্জাতিক সালানা জলসা উপলক্ষ্যে ২৮ শে ডিসেম্বর, ২০১৬ তারিখে লন্ডনের তাহের হল থেকে এম.টি.এ-র যোগাযোগ ব্যবস্থার মাধ্যমে সরাসরি প্রদত্ত হুযুর আনোয়ার (আই.)-এর সমাপনী ভাষণ

أَشْهَدُ أَنْ لَّا إِلٰهَ إِلَّا اللّٰهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ

أَمَّا بَعْدُ فَأَعُوذُ بِاللّٰهِ مِنَ الشَّيْطٰنِ الرَّجِيمِ - بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيمِ -

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعٰلَمِينَ - الرَّحْمٰنِ الرَّحِيمِ - مٰلِكِ يَوْمِ الدِّينِ - إِيَّاكَ نَعْبُدُ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ -

اِهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمَ - صِرَاطَ الَّذِينَ أَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ غَيْرِ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ وَلَا الضَّآلِّينَ -

قُلْ إِنْ كُنْتُمْ تُحِبُّونَ اللّٰهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللّٰهُ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَاللّٰهُ غَفُورٌ رَّحِيمٌ (آل عمران:32)

আমরা যদি চাই যে, আল্লাহ তা'লার নৈকট্য অর্জিত হোক, আল্লাহ্ তা"লা আমাদের দোয়া গ্রহণ করুক, আমাদের হৃদয়ে আল্লাহ্ তা'লার ভালবাসা সৃষ্টি হোক, তবে এর জন্য আল্লাহ্ তা'লা একটি নীতি বর্ণনা করেছেন। তিনি বলেছেন এই সমস্ত বিষয় তোমরা তখনই অর্জন করতে পারবে যখন তোমরা রসুলুল্লাহ্ (সা.)-এর আদর্শ অনুযায়ী নিজেদের পরিচালিত করবে, এবং তাঁর আদর্শকে বোঝার জন্য, সেই আদর্শবলীর উপর অনুশীলন করার জন্য এটিও আল্লাহ্ তা'লার অপার অনুগ্রহ যে, তিনি সাহাবা (রা.) গণের মাধ্যমে সেই সকল আদর্শ আমাদের নিকট পৌঁছে দিয়েছেন যেগুলির উপর মহানবী (সা.) আমল করতেন। কিন্তু একথাও অনুধাবন করা আবশ্যক যে মহানবী (সা.) কেবল সেই সমস্ত কাজ করতেন এবং কথা বলতেন যেগুলি সম্পর্কে আল্লাহ্ তা'লা কুরআন মজীদে বর্ণনা করেছেন। হযরত আয়েশা (রা.) কে মহানবী (সা.)-এর চরিত্র এবং কর্মবিধি সম্পর্কে জিজ্ঞসা করা হলে তিনি (রা.) সুন্দরভাবে কেবল তিনটি শব্দ দ্বারা তাঁর আদর্শ বর্ণনা করেন। كَانَ خُلُقُهُ الْقُرْآن (মসনদ আহমদ বিন হাম্বিল, ৮ম খণ্ড, পৃষ্ঠা: ১৪৪) অর্থাৎ তাঁর চরিত্র এবং কর্মবিধি সেটিই যা কুরআনের মত মহানগ্রন্থ নিজের মধ্যে সমাবিষ্ট রেখেছে। এযুগে আল্লাহ্ তা'লা আমাদের উপর আরও একটি অনুগ্রহ করে নিজের প্রত্যাদিষ্ট পুরুষ,আঁ হযরত (সা.)-এর একনিষ্ঠ সেবক দাস এবং যুগের ইমাম মসীহ মওউদ ও মাহদী মাহদকে প্রেরণ করেছেন যিনি আমাদেরকে নবীদের প্রকৃত মর্যাদা ও সম্মান এবং বিশেষ করে আঁ হযরত (সা.) এবং তাঁর আদর্শ সম্পর্কে আরও বেশি ব্যুতপত্তি দান করেছেন।

সৈয়্যেদানা হযরত মসীহ মওউদ (আ.) এক স্থানে বলেন: " স্মরণ রাখা উচিত যে, আম্বিয়া, রসুল এবং যুগের ইমামদের আগমণের উদ্দেশ্য কি? তাঁরা পৃথিবীতে নিজেদের পুজো করানোর জন্য আসেন না। তাঁরা এক-অদ্বিতীয় খোদার ইবাদত প্রতিষ্ঠিত করতে চান। তাঁদের আগমণের উদ্দেশ্য এটিই যে মানুষ যেন তাঁদের নমুনাকে অনুসরণ করে এবং তাঁদের ন্যায় হওয়ার চেষ্টা করে এবং এমনভাবে অনুসরণ করে যেন মানুষ তাঁদের সঙ্গে একাত্ম হয়ে যায়। কিন্তু পরিতাপের বিষয় হল, কিছু মানুষ তাদের আগমণের প্রকৃত উদ্দেশ্যকে জলাঞ্জলি দিয়ে তাদেরকে খোদা মনে করে বসে। এহেন কর্মে ইমাম ও রসুলগণ প্রীত হতে পারেন না যে মানুষ তাদের এমন উচ্চ মর্যাদা প্রদান করুক । কখনোই নয়। তাঁরা এটিকে কোন আনন্দের কারণ বলে গণ্য করেন না। মানুষ তাঁদের পদাঙ্ক অনুসরণ করুক এবং তাদের আনীত শিক্ষার উপর প্রতিষ্ঠিত হোক, তাঁদের প্রকৃত আনন্দ এরই মধ্যে নিহিত। অর্থাৎ প্রকৃত খোদার ইবাদত করা এবং একত্ববাদের উপর প্রতিষ্ঠিত হওয়া। সুতরাং আঁ হযরত (সা.)-এর উপরও এই আদেশ অবতীর্ণ হয়- كُنْتُمْ تُحِبُّونَ اللّٰهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللّٰهُ (আলে ইমরান: ৩২) অর্থাৎ হে রসুল তুমি তাদেরকে বলে দাও! যদি তোমরা চাও যে, আল্লাহ্ তোমাদেরকে ভালবাসুক তবে আমাকে অনুসরণ কর। এই অনুসণের পরিণামে আল্লাহ্ তা'লা তোমাদেরকে ভালবাসবেন।" তিনি বলেন, এর থেকে স্পষ্ট বোঝা যায় যে, আল্লাহ্ তা'লার প্রিয়ভাজন হওয়ার পদ্ধতি হল, রসুলুল্লাহ (সা.)-এর প্রকৃত আনুগত্য। অতএব এই কথাটি সর্বদা স্মরণ রাখা উচিত যে, আম্বিয়া (আ.) এবং অনুরূপভাবে খোদা তা'লার অন্যান্য সত্যান্বেষীগণ পৃথিবীতে একটি নমুনা স্বরূপ আগমণ করেন। যে ব্যক্তি এই নমুনা অনুসারে চলার চেষ্টা করে না কিন্তু তাদেরকে সিজদা করে এবং চাহিদাপুরণকারী রূপে মেনে নিতে প্রস্তুত হয় খোদা তা'লার নিকট তার কোন মূল্য নেই বরং মৃত্যুর পর সে দেখবে যে সেই ইমাম তার সম্পর্কে উদাসীন।"

(মালফুযাত, ৬ষ্ঠ খণ্ড, পৃষ্ঠা: ২৮৮-২৮৯)

অতএব আম্বিয়াগণ প্রথম বিষয় যা মানুষকে শিখিয়ে থাকেন এবং মহানবী (সা.) যার পরম মার্গে অধিষ্ঠিত সেটি হল একত্ববাদের প্রতিষ্ঠা। মহানবী (সা.) এই একত্বাবাদই তাঁর মান্যকারীদের মধ্যে সৃষ্টি করেছেন। এর সর্বোত্তম দৃষ্টান্ত আমরা তাঁর সাহাবাগণের মধ্যে লক্ষ্য করি। সাহাবাগণ সরাসরি মহানবী (সা.)-এর কাছ থেকে কল্যাণমণ্ডিত হয়েছেন। সাহাবগণ তাঁর (সা.) বান্দেগীর মর্যাদা এবং একত্ববাদ প্রতিষ্ঠার জন্য তাঁর ব্যাকুলতা প্রত্যক্ষ করেছেন। আল্লাহ্ তা'লার সঙ্গে তাঁর ভালবাসা এবং ইবাদতের মান তাঁরা দেখেছেন। এর ফলে তাদের মধ্যেও প্রকৃত একত্ববাদের প্রেরণা জন্ম নিয়েছে। যেরূপ আমি বলেছি, আঁ হযরত (সা.)-এর আদর্শ আমাদের নিকট পৌঁছে দিতে সাহাবাগণেরও অবদান আছে বরং এটি আমাদের প্রতি তাদের অনুগ্রহ। কয়েকটি ঘটনা উপস্থাপন করছি।

একবার হযরত উমর (রা.) তাঁর পিতার শপথ নিচ্ছিলেন। বিষয়টি আঁ হযরত (সা.)-এর কর্ণগোচর হয়। তিনি (সা.) বলেন, দেখ! আল্লাহ্ তা'লা তোমাদেরকে পিতার শপথ নিতে নিষেধ করেছেন। যার কসম বা শপথ নেওয়ার নেওয়ার প্রয়োজন হয় সে যেন আল্লাহ্র কসম খায় অথবা নীরব থাকে। (সহী বুখারী, কিতাবুল আদাব)। অতএব আল্লাহ্ তা'লা ব্যতীত কারোর কসম খাওয়া বৈধ নয়। অনেকে নিজ সন্তানের, প্রিয়জন বা নিকটাত্মীয়ের কসম খেয়ে বসে। এবং মনে করে যে, এরা যেহেতু আমাদের প্রিয়জন তাই এদের নামে কসম খেলে অপরপক্ষ বিশ্বাস করে নিবে। কিন্তু

যুগ ইমামের বাণী

খোদা তোমাদের সঙ্গে থাকবেন, যদি তোমরা মুত্তাকি হও এবং তাকওয়ার সূক্ষ্ম পথসমূহে বিচরণ কর।

(মালফুযাত, ১ম খণ্ড, পৃ: ২০০)

দোয়াপ্রার্থী: Sk.Fayjal Sb. and Family, Jaynagar, Bankura, WB

একজন মোমিনের সবসময় স্মরণ রাখা উচিত যে, এই কাজটি তৌহিদ বা একত্ববাদ থেকে দূরে নিয়ে যায়।

একবার একজন প্রশ্নকর্তা বলেন, হে রসূলুল্লাহ্ (সা.) কেউ যুদ্ধ করে নিজের আত্মাভিমানের জন্য, কেউ বা নিজের বীরত্ব প্রদর্শনের জন্য আবার কেউ বা মালে গনীমত বা লুঠের মাল লাভের জন্য। এদের মধ্যে জিহাদকারী কে? মহানবী (সা.) উত্তর দিলেন: যে ব্যক্তি এই কারণে যুদ্ধ করে যেন আল্লাহ্‌র বাণী মুখরিত হয় এবং একত্ববাদ প্রতিষ্ঠিত হয়, সেই ব্যক্তিই আল্লাহ্‌র পথে প্রকৃত জিহাদকারী বলে গণ্য হবে।

(সহী বুখারী, কিতাবুল জিহাদ)

অতএব প্রত্যেক সেই কর্ম যা একত্ববাদ প্রতিষ্ঠার জন্য সম্পাদিত হয় সেটিই আল্লাহ্ তা'লার নিকট পছন্দনীয় এবং এই কাজের জন্যই আঁ হযরত (সা.) আবির্ভূত হয়েছিলেন।

একবার মক্কার সর্দাররা আঁ হযরত (সা.)কে আলোচনার জন্য ডাকেন। আঁ হযরত (সা.) মনে করেন যে, হয়তো তারা কোন ধারণার বশবর্তী হয়ে সঠিক পথ অবলম্বনের জন্য মনস্থির করেছেন। সুতরাং তিনি (সা.) অনতিবিলম্বে সেখানে পৌঁছে যান। মক্কার সর্দাররা সর্বসম্মতিক্রমে বললেন, হে মহম্মদ! (সা.) আমরা আপনাকে আলোচনার জন্য ডেকেছি। আরবদের মধ্যে এমন কোন ব্যক্তিকে জানি না যে নিজের জাতিকে এমন বিপাকে ফেলেছে যেরূপ আপনি আমাদেরকে কঠিন পরিস্থিতির সম্মুখীন করেছেন। আপনি আমাদের উপাস্যগণকে গালি দেন। আপনি আমাদের দলের মধ্যে বিভাজন সৃষ্টি করে দিয়েছেন। এমন কোন বিশৃঙ্খলা নেই যা আপনার কারণে সৃষ্টি হয় নি। (অর্থাৎ তাদের দৃষ্টিতে, জাগতিকতার দৃষ্টিকোণ থেকে যে সব বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি হওয়া সম্ভব ছিল। বস্তুতঃ তিনি তো পৃথিবীর সংশোধনের জন্যই আবির্ভূত হয়েছিলেন। তারা বলল-) যদি ধন-সম্পদ অর্জন করা আপনার উদ্দেশ্যে হয়ে থাকে তবে আমরা আপনাকে এত পরিমাণ ধন-সম্পদ দিব যে আপনি আমাদের মধ্যে ধনীতম ব্যক্তি হয়ে উঠবেন। যদি আপনার সর্দার হওয়ার বাসনা থাকে তবে আমরা আপনাকে সর্দার রূপে স্বীকার করছি। তিনি (সা.) বললেন, তোমরা আমাকে ভুল বুঝেছ। এমন আকাঙ্খা আমার মধ্যে নেই। আমি জাগতিক খ্যাতি ও সম্মান চাই না। খোদা তা'লা আমাকে রসুল করে পাঠিয়েছেন। আমার উপর কিতাব অবতীর্ণ করেছেন এবং আদেশ দিয়েছেন যে, আমি যেন সুসংবাদদাতা এবং সতর্ককারী হয়ে তোমাদেরকে সুসংবাদও দিই এবং সতর্কও করি। আমি যেন একত্ববাদ প্রতিষ্ঠা করি। অতএব আমি তোমাদের নিকট খোদা তা'লার বাণী পৌঁছে দিয়েছি। যদি তোমরা এটি গ্রহণ কর তবে এতে তোমাদের নিজেদের মঙ্গল। আর যদি তোমরা গ্রহণ না কর তবে তোমরা সেই দিন পর্যন্ত অপেক্ষা কর আর আমিও অপেক্ষা করছি যতক্ষণ পর্যন্ত না খোদা তা'লা আমাদের মধ্যে মীমাংসা করে দেন। এরপর বিশ্ববাসী দেখেছে যে, কিভাবে আল্লাহ্ তা'লা তাদের মধ্যে মীমাংসা করেছেন এবং কীভাবে একত্ববাদের প্রতিষ্ঠা হয়েছে। (সীরাত ইবনে হিশশাম)

আঁ হযরত (সা.)-এর বান্দেগীর উল্লেখ করে সৈয়্যদানা হযরত মসীহ মওউদ (আ.) বলেন: " কুরআন করীম পাঠ করে দেখ, শুধু তাই নয়, আমাদের নবী করীম (সা.) থেকে শ্রেষ্ঠ পৃথিবীতে কোন পূর্ণ মানবের নমুনা বিদ্যমান নেই আর ভবিষ্যতে কিয়ামত পর্যন্তও হবে না। এরপর দেখ, মোজেযা দেখানোর শক্তি লাভ হওয়া সত্বেও হুযুর (সা.) সব সময় পরম বিনয়ী থেকেছেন। এবং বার বার কেবল বলে এসেছেন 'ইন্নামা আনা বাশারুম মিসলিকুম' (আল-কাহাফ: ১১১) অর্থাৎ নিশ্চয় আমি তোমাদের মতই মানুষ'। এমনকি কলেমায়ে তৌহিদে তাঁর বান্দা হওয়ার স্বীকারোক্তীকে অনিবার্য অংশ বলে গণ্য করেছেন। যেটি ছাড়া একজন মুসলমান মুসলমানই থাকতে পারে না। ভেবে দেখ! আরও একবার ভেবে দেখ! যে পরিস্থিতিতে পূর্ণ পথ-প্রদর্শনকারীর জীবনযাপন পদ্ধতি আমাদেরকে শিক্ষা প্রদান করছে যে, নৈকট্যের পরম মার্গে উপনীত হয়ে নিজের বান্দা হওয়াকে অস্বীকার করেন নি, তবে অন্য কারোর বিষয়ে এমন ধারণা করা এবং এমন কথাকে হৃদয়ে স্থান দেওয়াই বৃথা।" (মালফুযাত, ১ম খণ্ড, পৃষ্ঠা: ১১৭-১১৮)

অতএব এই ব্যুতপত্তি ও তত্ত্বজ্ঞান হযরত মসীহ মওউদ (আ.) আমাদেরকে দিয়েছেন যে, যখন একজন মুসলমান এই ঘোষণা করে যে, أَشْهَدُ أَنْ لَّا إِلٰهَ إِلَّا اللّٰهُ তখন আশহাদু আন্না মুহাম্মাদান আব্দুহু ও রাসুলুহ' ঘোষণাও আবশ্যক। অতএব পূর্ণ নবী যখন আল্লাহ্‌র বান্দা হতে পারেন তবে সেই সমস্ত মানুষের কাজকে কিভাবে বৈধতা দেওয়া যেতে পারে যারা পীর ও ফকিরদেরকে এর থেকে বেশি মর্যাদা দিয়ে তাদের কবরে সিজদা করে। বরং এটি ভয়ানক পাপ এবং শিরক। এটি আল্লাহ্ তা'লার অনুগ্রহ যে, তিনি আমাদেরকে হযরত মসীহ মওউদ (আ.) কে মান্য করার তৌফিক দান করেছেন যিনি আমাদেরকে একত্ববাদ সম্পর্কে মৌলিক যুক্তি ও জ্ঞান এবং আঁ হযরত (সা.) -এর বান্দা হওয়ার সঠিক ব্যুতপত্তি দান করেছেন এবং আমাদের যাবতীয় শিরক থেকে পবিত্র করেছেন।

সৈয়্যদানা হযরত মসীহ মওউদ (আ.) একস্থানে বলেন:

" আমি সর্বদা বিস্ময়ের সাথে লক্ষ্য করি যে,এই যে আরবী নবী যাঁর নাম 'মুহাম্মদ' (তাঁর প্রতি হাজার হাজার দরূদ ও সালাম), তিনি কতই না উচ্চ মর্যাদার নবী। তাঁর উচ্চ অবস্থান বা মোকামের সীমা কল্পনাও করা যায় না এবং তাঁর পবিত্রতা ও আধ্যাত্মিকতার প্রভাব ও কার্যকারিতার সঠিক অনুমান করা মানুষের পক্ষে সম্ভব নয়। আফসোস যে, তাঁর মর্যাদা যেভাবে সনাক্ত করা উচিত ছিল, সেভাবে সনাক্ত করা হয় নি। সেই তওহীদ যা দুনিয়া থেকে বিলুপ্ত হয়ে গিয়েছিল, তিনিই একমাত্র বীরপুরুষ, তা দুনিয়াতে পুনরায় প্রতিষ্ঠিত করেছেন। এবং চূড়ান্ত পর্যায়ে মানুষের প্রতি ভালবাসায় জীবন অতিবাহিত করেছেন। এজন্যই খোদা, যিনি তাঁর (সা.) হৃদয়ের রহস্য জানতেন, তিনি তাঁকে সমস্ত নবী ও সমস্ত প্রথম ও শেষের ব্যক্তিগণের অর্থাৎ আউয়ালীন ও আখেরীনদের উপরে উন্নীত করেছেন। এবং তাঁর কাঙ্খিত সকল প্রত্যাশাই তাঁর জীবনে পূর্ণ করে দিয়েছেন। "

(হাকীকাতুল ওহী, রূহানী খাযায়েন,পৃষ্ঠা: ১১৮-১১৯)

একত্ববাদ প্রতিষ্ঠার পরাকাষ্ঠা সেই সময় সম্পূর্ণ হয় যখন মানুষ আল্লাহ্ তা'লার ইবাদতের অধিকারও পুরণ করে এবং এক্ষেত্রেও আমাদের প্রিয় নবী হযরত মহম্মদ (সা.) উচ্চতম মর্যাদা অর্জন করেছেন আল্লাহ্ তা'লা যেটি সম্পর্কে সাক্ষ্য প্রদান করেন যে, الَّذِي يَرَاكَ حِينَ تَقُومُ وَتَقَلُّبَكَ فِي السَّاجِدِينَ (আশ-শোয়রা: ২১৯-২২০) অর্থাৎ যিনি তোমার দণ্ডায়মান হওয়া দেখেন সেজদাকারীদের মধ্যে তোমার ব্যকুলতা প্রত্যক্ষ করেছেন। অতএব আল্লাহ্ তা'লা এই ঘোষণা দিচ্ছেন যে, হে মহম্মদ! (সা.) সমস্ত সেজদাকারীদের মধ্যে তোমার ন্যায় ব্যাকুলভাবে সেজদকারী কেউ নেই। তুমি একত্ববাদ প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে নিষ্ঠাবানদের এমন এক জামাত তৈরী করেছ যারা আল্লাহ্ তা'লার ইবাদতের ক্ষেত্রে অনবদ্য, যাদের রাত্রিগুলি ইবাদতের মধ্য দিয়ে অতিবাহিত হয়। কিন্তু এই সমস্ত ইবাদত ও সেজদাগুলি ছিল তোমার সেজদার নমুনাকে আত্মস্থ করার প্রচেষ্টা। এই সকল সেজদার ব্যাকুলতায় যেখানে আমরা আঁ হযরত (সা.)-এর একত্ববাদ প্রতিষ্ঠার জন্য আকুলতা দেখতে পাই সেখানে আমরা এও লক্ষ্য করি যে, তিনি (সা.) তাঁর মান্যকারীদের মধ্যে এমন সেজদাকারীর জামাত তৈরী করতে চেয়েছিলেন যারা একনিষ্ঠভাবে কেবল আল্লাহ্‌র সম্মুখে নতজানু হবে এবং তাঁরই ইবাদত করবে। যারা হৃদয়ে ঘর করে বসা উপাস্যগুলিকে বের করে দিবে। আঁ হযরত (সা.) একবার বলেন: প্রত্যেক নবীর কোন না কোন বাসনা থাকে। আমার বাসনা হল রাতের ইবাদত। (কুনযুল আমাল, ৭ম খণ্ড, পৃষ্ঠা: ৩২৩) একজন বর্ণনাকারী বর্ণনা করেন যে, আমি রসুলুল্লাহ্ (সা.)-কে নামায পড়তে দেখেছি। সেই পরম অনুনয়-বিনয়ের মুহূর্তে তাঁর বক্ষদেশ থেকে এমন শব্দ নির্গত হচ্ছিল যেরূপে জাঁতাকল থেকে শব্দ উৎপন্ন হয়।

(সুনান আবু দাউদ, কিতাবুর রুকু ওয়াস সুজুদ)

অনুরূপভাবে আরও একটি বর্ণনায় আছে, এমন শব্দ হচ্ছিল যেন হাঁড়িতে পানি ফুটছিল। " (সুনান আন নেসাঈ, কিতাবুস সাহু)

হযরত উম্মে সালমা (রা.) বর্ণনা করেন যে, মহানবী (সা.) কিছু সময় ঘুমাতেন এবং এরপর ঘুম থেকে উঠে কিছু সময় নামাযে ডুবে থাকতেন। এরপর তিনি ঘুমিয়ে পড়তেন এবং পুনরায় জেগে যেতেন। মোটকথা সকাল পর্যন্ত এমনটিই চলতে থাকত।

(সুনান আন নিসাঈ, কিতাবুল কিয়ামুল লাঈল)

হযরত আয়েশা (রা.) বলেন, মহানবী (সা.) অসুস্থতা বা অন্য কোন কারণে যদি তাহাজ্জুদের নামায না পড়তেন, তবে তিনি (সা.) দিনের বেলায় বারো রাকাত নফল নামায পড়তেন।

(সুনান আন নিসাঈ, কিতাবুল কিয়ামুল লাঈল)

আঁ হযরত (সা.) তাঁর মান্যকারীদের জন্যও এই একই প্রত্যাশা করতেন যে, তারা যেন ইবাদতকারী হয় এবং সঠিক অর্থে ইবাদত করে।

আঁ হযরত (সা.)-এর বাসনা ছিল তাঁর উম্মতের মানুষদের ইবাদতের মান যেন উচ্চ হয়। তাঁর এই মনোবাঞ্ছার প্রভাবে হযরত আয়েশা (রা.) একবার উপদেশ দান করতে গিয়ে বলেন, কখনো রাতের নামায ত্যাগ করো না। কেননা রসুলুল্লাহ (সা.) এটি ত্যাগ করতেন না। যখন তিনি

যুগ খলীফার বাণী

যুবক খুদ্দাম ও আতফালদেরকে নিজেদের সাহচর্যের বিষয়ে অত্যন্ত সচেতন হতে হবে। বন্ধুত্ব তাদের সাথে রাখুন যাদের মধ্যে ঈমান ও নিষ্ঠা রয়েছে, যারা অনৈতিক ও অশালীন কাজকর্মে লিপ্ত নয়।

(রোযনামা আল ফজল, অনলাইন, ২৯ শে নভেম্বর, ২০২২)

দোয়াপ্রার্থীঃ Humayun Kabir Molla, Nalhati, Birbhum

অসুস্থ হতেন, শরীর সঞ্জা দিত না তখন তিনি বসে তাহাজ্জুদের নামায পড়তেন । (মসনদ আহমদ বিন হাম্বল, ৮ম খণ্ড, পৃষ্ঠা: ২২২-২২৩)

আমি যে বর্ণনাটি এখন পাঠ করলাম অর্থাৎ যদি তাহাজ্জুদ নামায বাদ পড়ে গেলে তিনি (সা.) দিনের বেলায় ১২ রাকাত নামায পড়ে নিতেন- এমন ঘটনা হয়তো বিরলই ছিল। নচেত তিনি (সা.) একবার অসুস্থ অবস্থাতেই দুর্বলতা সত্বেও রাতের নামাযে দীর্ঘ সুরা পাঠ করেছেন। তাঁর অসুস্থতার লক্ষণ সাহাবীগণও তাঁর শরীর ও চেহারার মধ্যে স্পষ্টভাবে লক্ষ্য করছিলেন। (কুনযুল আমাল, ২ য় খণ্ড, পৃষ্ঠা: ১৩৩) সমস্ত দোয়া এবং ইবাদতে তিনি (সা.) এ বিষয়ের উপরই গুরুত্ব দিতেন যে, তাঁর উম্মত যেন প্রকৃত ইবাদতকারী হয় এবং নিজ প্রভু খোদার সম্মুখে নতজানু হয়ে থাকে। তাঁর সাহাবাগণ এই ব্যাকুলতা লক্ষ্য করেছিলেন এবং তাঁর সান্নিধ্য লাভ থেকে প্রভাবিত হয়েছিলেন। তারা মহানবী (সা.)-এর আদর্শকে গ্রহণ করেছিলেন। যারা মুশরিক ছিলেন এমন ইবাদতকারীতে পরিণত হলেন যে, আগত প্রজন্মের জন্য নমুনা হয়ে থাকলেন। তাদের মধ্যে এক বিপ্লব সাধিত হল।

এ সম্পর্কে হযরত মসীহ মওউদ (আ.) বলেন:

" আমি দাবীর সঞ্জো বলছি, যতই ঘোর শত্রু হোক না কেন, সে খৃষ্টান হোক বা আর্য, যখন তারা আঁ হযরত (সা.)-এর পূর্বে আরবদের অবস্থাকে দেখবে এবং সেই পরিবর্তনের দিকে দৃষ্টিপাত করবে যা আঁ হযরত (সা.)-এর শিক্ষা এবং প্রভাবের কারণে সৃষ্টি হয়েছিল, তখন সে অবলীলাক্রমে মহানবী (সা.)-এর সত্যতার প্রতি সাক্ষ্য দিতে বাধ্য হবে। মোটকথা, কুরআন করীম প্রাথমিক যুগের যে চিত্রায়ন করেছে يَأْكُلُوْنَ كَمَا تَأْكُلُ الْاَنْعَامُ (মুহাম্মদ: ১৩) (অর্থাৎ পশুর ন্যায় আহার করাই ছিল তাদের কর্ম) এটি তো ছিল তাদের কুফরের অবস্থা। অতঃপর আঁ হযরত (সা.)-এর পবিত্র প্রভাব তাদের মধ্যে পরিবর্তন সৃষ্টি করার ফলে তাদের অবস্থা দাঁড়াল এই যে তারা নিজ প্রভু-প্রতিপালকের সমীপে সিজদারত এবং দন্ডায়মান অবস্থায় নিজেদের রাত্রি যাপন করত। (আল ফুরকান: ৬৫) আঁ হযরত (সা.) আরবদের পশুতুল্য মানুষদের মধ্যে যে পরিবর্তন সাধন করেছিলেন এবং যে অতল গহ্বর থেকে উদ্ধার করে তাদেরকে এমন উচ্চতর মর্যাদায় পৌঁছে দিয়েছিলেন- এই সমস্ত অবস্থার রূপরেখা দেখার পর মানুষ আবেগতাড়িত হয়ে কেঁদে ফেলে। কেননা এটি এমন এক অসাধারণ বিপ্লব ছিল যা তিনি (সা.) সাধন করেছিলেন। পৃথিবীর কোন ইতিহাসে এবং কোন জাতির মধ্যে এমন নজির পাওয়া যেতে পারে না।

(মালফুযাত, ৯ম খণ্ড, পৃষ্ঠা: ১৪৪-১৪৫)

এটি নিছক কাহিনী নয়। এগুলি বাস্তব ঘটনা, সকলকেই যেগুলির সত্যতা অকপটে স্বীকার করতে বাধ্য হয়েছে। এই সত্যকেই প্রতিষ্ঠিত করার উদ্দেশ্যে এই যুগে হযরত মসীহ মওউদ (আ.)-এক আল্লাহ্ তা'লা প্রেরণ করেছেন। অতএব নিজেদের ইবাদতের মানকে উচ্চতর করা এবং কেয়ামত পর্যন্ত স্থায়ী সেই আদর্শের উপর পরিচালিত হওয়াও আমদেরই কাজ।

নফল প্রসঙ্গে আমি রেওয়ায়াত বর্ণনা করেছি। যখন নফল সম্পর্কে এই নির্দেশনা আছে এবং এত গুরুত্ব প্রদান করা হয়েছে তখন ফরয নামাযের জন্য কিরূপ নিয়মনিষ্ঠতা দেখানো আবশ্যক! অতএব আমাদের প্রত্যেকের আত্ম-পর্যালোচনা করা এবং এ বিষয়ের উপর গুরুত্ব প্রদান করা জরুরী।

আম্বিয়াগণ পৃথিবীতে আগমণ করেন সত্যের প্রসারের উদ্দেশ্যে, নিজের অনুসারীদেরকে সত্যের উপর চালিত করার উদ্দেশ্যে এবং সত্য খোদার দিকে নতজানু করতে। এক্ষেত্রেও মহানবী (সা.)-কে উচ্চতম স্থান প্রদান করা হয়েছে। আশৈশব তাঁর মধ্যে এই গুণ এমন প্রকট ছিল যে, শত্রুরাও তাঁর সত্যতাকে স্বীকার করেছে। একবার কুরায়েশদের সর্দাররা একটি স্থানে সমবেত হয়েছিল যাদের মধ্যে সর্বাপেক্ষা ঘোর বিরোধী আবু জাহল এবং নাযার বিন হারিসও ছিল। যখন মহানবী (সা.) সম্পর্কে বলা হল যে, তাঁকে জাদুগর ও মিথ্যাবাদী অপবাদ দিয়ে তাঁর কুখ্যাতি ছড়িয়ে দেওয়া হোক। তখন নাযার বিন হারিস উঠে দাঁড়িয়ে বললেন হে কুরায়েশ! এমন একটি বিষয় তোমাদের সামনে এসে পড়েছে যার মোকাবেলা করার জন্য তোমরা কোন পরিকল্পনাও তৈরী করতে পার নি। মুহাম্মদ (সা.) তোমাদের মধ্যে যুবক ছিলেন এবং তোমাদের নিকট সর্বাপেক্ষা প্রিয় ছিলেন। সব থেকে বেশি সত্যবাদী ছিলেন। তোমাদের মধ্যে সর্বাপেক্ষা বিশ্বস্ত ছিলেন। এখন তাঁর চুল সাদা হতে শুরু করেছে। (বয়স বেড়েছে) যে বাণী তিনি নিয়ে এসেছেন তার কারণে তোমরা তাঁকে মিথ্যাবাদী বলছ, তাঁকে জাদুকর বলছ। আমরা মিথ্যাবাদীও দেখেছি, জাদুকরও দেখেছি। তোমরা তাঁকে গণক অপবাদ দাও, আমি গণকও দেখেছি। তোমরা তাঁকে কবি আখ্যা দিয়েছ। আমি কবিও দেখেছি। তোমরা তাকে উন্মাদ বলেছ। (নাউযুবিল্লাহ্) আমি উন্মাদও দেখেছি। না তিনি মিথ্যাবাদী, না তিনি জাদুকর, না তিনি গণক আর না তিনি কবি বা উন্মাদ। এগুলির কোনও লক্ষণই তাঁর মধ্যে বিদ্যমান নয়। অতএব তোমরা ভেবে দেখ! তোমাদের মোকাবিলা একটি অসাধারণ বিষয়ের সঞ্জো। (সীরাত ইবনে হিশশাম) এটি ছিল শত্রুর উক্তি।

একবার আবু জাহল মহানবী (সা.)-এক সম্বোধন করে বলল, আমি তোমাকে মিথ্যাবাদী বলছি না, আমি তোমার শিক্ষাকে মিথ্যা বলে মনে করি। (সুনান তিরমিযী, আবওয়াবুত তাফসীরুল কুরআন) আঁ হযরত (সা.) বললেন, আমি তোমাদের মধ্যে এতকাল ছিলাম, কিন্তু কখনো আমার মিথ্যা প্রমাণ করতে পার নি। আমাকে কখনো মিথ্যাবাদী বলতে পার নি। আজকে এই শিক্ষা আনার কারণে খোদা তা'লার বিষয়ে আমি মিথ্যা বলব?

হযরত মসীহ মওউদ (আ.) বলেন: " আম্বিয়া হলেন তাঁরা যাঁরা নিজেদের পূর্ণ সত্যের শক্তিশালী দলিল উপস্থাপন করে শত্রুদেরকেও অভিযুক্ত করেছে, যেরূপ হযরত খাতামুল আম্বিয়া মহম্মদ (সা.)-এর পক্ষ থেকে এই অভিযোগ কুরআন শরীফে বিদ্যমান, যেখানে তিনি (সা.) বলেছেন, 'ফাকাদ লাবিসতু ফিকুম উমারাম মিন কাবলিহি আফালা তাকেলুন' (সুরা ইউনুস: ১৭) অর্থাৎ আমি মিথ্যা বলছি না। দেখ! এর পূর্বে আমি চল্লিশ বছর তোমাদের মধ্যে থেকেছি। তোমরা কি কখনো আমাকে মিথ্যাবাদী পেয়েছ? মোটকথা আম্বিয়াগণের জীবনী এমনই স্পষ্ট এবং প্রমাণসিদ্ধ যে, যদি সমস্ত বিষয়কে একপাশে রেখে কেবল যদি তাদের ঘটনাবলীর প্রতি দৃষ্টিপাত করা হয় তবে তাদের সত্যতা তাদের ঘটনাবলী থেকেই দিবালোকের ন্যায় সুস্পষ্টরূপে প্রমাণিত হয়। উদাহরণ স্বরূপ যদি কোন ন্যায়পরায়ণ এবং বিবেকবান মানুষ হযরত খাতামুল আম্বিয়ার নবুয়তের সত্যতার এই সমস্ত দলিল উপেক্ষা করে কেবল তাঁর সঞ্জো জড়িত ঘটনাবলীর প্রতিই গভীরভাবে দৃষ্টি দেয়, তবে নিঃসন্দেহে ঐ সকল ঘটনাবলীকে বিশ্লেষণ করেই সে তাঁকে অন্তর থেকে সত্য নবী হিসেবে বিশ্বাস করবে। আর কেনই বা সে করবে না? সেই সকল ঘটনাবলী এমনই পূর্ণ সত্যতা এবং স্বচ্ছতা দ্বারা সুরভিত যে, সত্যান্বেষীদের হৃদয় অনায়াসে তাঁর দিকে আকৃষ্ট হয়।"

(বারাহীনে আহমদীয়া, রূহানী খাযায়েন, ১ম খণ্ড, পৃষ্ঠা: ১০৭-১০৮)

শৈশবকালও তাঁর সত্যতার সাক্ষ্য প্রদান করে। তাঁর যৌবনকালও সাক্ষ্য দেয় এবং নবুয়তের পর এটি পরম উৎকর্ষতা লাভ করে। অতএব এই নবীর মান্যকারীদের আত্ম-বিশ্লেষণ করা উচিত যে, আমাদের সত্যতার মান কি হওয়া উচিত।

আঁ হযরত (সা.)-এর আরও একটি গুণ বিনয় ও নম্রতার উচ্চ মান সম্পর্কে উল্লেখ করে হযরত মসীহ মওউদ (আ.) এক স্থানে বলেন: " দেখ! যদি আমাদের নবী (সা.)-এর সফলতা এমন পর্যায়ের ছিল যে, পূর্বের সমস্ত নবীদের মধ্যে তার তুলনা পাওয়া যায় না। কিন্তু খোদা তা'লা তাঁকে যত বেশি সফলতা দান করেছেন, তিনি (সা.) ততই বিনম্রতা অবলম্বন করতে থেকেছেন। একবার এক ব্যক্তিকে তাঁর সমীপে বন্দী করে নিয়ে আসা হল। তিনি (সা.) লক্ষ্য করলেন সেই ব্যক্তি ভীত-ত্রস্ত হয়ে কেঁপে চলেছিল। কিন্তু যখন সে নিকটে এল তিনি (সা.) অত্যন্ত বিনম্রতার সাথে তাকে বললেন, তুমি এত ভয় পাচ্ছ কেন? আমিও তো তোমারই মত একজন মানুষই বটে এবং এক বৃদ্ধার সন্তান। "

(মালফুযাত, ১০ম খণ্ড, পৃষ্ঠা: ২৫৮)

একটি হাদীস থেকে আঁ হযরত (সা.)-এর বিনম্রতা সম্পর্কে জানা যায় এবং এর মধ্যে তাঁর মান্যকারীদের উদ্দেশ্যে উপদেশও রয়েছে যে, কীভাবে তাদের জীবন যাপন করা উচিত।

হযরত আবু হুরাইরা (রা.) বর্ণনা করেন যে, আঁ হযরত (সা.) বলেছেন: তোমাদের মধ্যে কেউই নিজের কর্মের সুবাদে নাজাত লাভ করবে না। সাহাবাগণ নিবেদন করলেন, হে রসূলুল্লাহ (সা.)! আপনিও? তিনি (সা.) বললেন, হ্যাঁ আমিও নিজের কর্মের কারণে নাজাত লাভ করব না। কিন্তু আল্লাহ্ তা'লা আমাকে স্বীয় রহমতের ছায়ায় আবৃত করবেন। তিনি (সা.) বলেন, অতএব তোমরা যদি সরল পথে পরিচালিত হও, শরীয়তের নিকটবর্তী থাক, সকাল, সন্ধ্যা ও রাত্রি বেলা ইবাদত কর এবং মধ্যপন্থা অবলম্বন কর তবে তোমরা নিজেদের লক্ষ্যস্থলে পৌঁছে যাবে।

(সহী বুখারী, কিতাবুর রিফাক)

অতএব যে নবী সম্পর্কে খোদা তা'লা বলেছেন যে, তাঁর বয়াত করার অর্থ হল আমার বয়াত করা এবং তাঁর হাত হল আমার হাত, কিন্তু আল্লাহ্ তা'লার ভয় এবং বিনয়ের অবস্থা দেখুন! তিনি বলেন, আমিও তাঁর কৃপা ও অনুগ্রহ বশতঃই মুক্তি লাভ করব। তিনি (সা.) আরও বলেন, তোমরা নিজেদের কর্মের উপর দৃষ্টি রাখ। নিজেদের ইবাদতের উপর দৃষ্টি রাখ এবং খোদা সম্পর্কে কখনো উদাসীন হয়ো না। কখনো ইবাদত সম্পর্কে অবহেলা করো না।

এরপর সফলতা ও বিজয় লাভ করার সময় মহানবী (সা.)-এর বিনয় প্রদর্শনের চিত্রটি দেখুন। জাগতিক নেতারা সফলতা অর্জন করলে ফেরাউন

হয়ে ওঠে। বরং সাধারণ মানুষও যদি কোন সফলতা পায় তবে গর্ব ও অহঙ্কারে তারা বুক ফুলিয়ে বেড়ায়। কিন্তু পূর্ণ মানবের আদর্শ দেখুন! সেই শহর যার বাসিন্দারা তাঁকে এবং তাঁর মান্যকারীদেরকে নির্যাতন করে বের করে দিয়েছিল এবং সেখানেই তারা থেমে থাকে নি বরং পরবর্তীতেও তারা ইসলামকে সমূলে ধ্বংস করার জন্য অবিরাম চেষ্টা করে গেছে। কিন্তু আল্লাহর লিখনই ভবিতব্য ছিল। অতঃপর আল্লাহ্ তা'লার নিয়তীক্রমে অবশেষে মক্কা বিজয়ের মুহূর্ত এসে পড়ল। তিনি এই শহরে বিজয়ী রূপে প্রবেশ করলেন। কিন্তু কেমন অবস্থায়? ইতিহাস বর্ণনা করে, মহানবী (সা.) যেদিন দশ হাজার কুদ্দুসীর সাথে বিজয়ীর বেশে মক্কায় প্রবেশ করলেন, (সীরাত ইবনে হিশশাম) সেটি তাঁর জন্য অত্যন্ত আনন্দ ও মহত্ব প্রকাশের দিন ছিল। কিন্তু মহানবী (সা.) খোদার এই সকল কৃপারাজি প্রকাশের জন্য খোদার পথে বিনয়ের পরম মার্গে উপনীত হলেন। খোদা তা'লা তাকে যত বেশি উচ্চ স্থানে অধিষ্ঠিত করলেন, তিনি (সা.) ততই বিনম্র হতে থাকলেন, এমনকি তিনি (সা.) যখন বিজয়ী রূপে মক্কায় প্রবেশ করছিলেন তখন তাঁর মস্তক নত হতে হতে উঁটের পেটে গিয়ে স্পর্শ করে। (সীরাত ইবনে হিশশাম)

হযরত মসীহ মওউদ (আ.) এই ঘটনাটিকে এইভাবে বর্ণনা করেছেন: "বিজয় ও মহত্ব যা আল্লাহ্ তা'লার বিশেষ বান্দাকে দেওয়া হয়ে থাকে সেটি বিনয় আকারে হয়ে থাকে এবং শয়তানের বিজয় অহংকারের সঙ্গে সম্পর্ক রাখে।" শয়তান অহংকার করে। " আমাদের নবী (সা.) যখন মক্কা বিজয় করলেন, তখন তিনি এমন ভাবে নতমস্তক হলেন এবং সিজদা করলেন যেভাবে বিপদ ও দুর্যোগের সময় তিনি (সা.) সিজদারত হতেন যখন এই মক্কাভূমিতেই বিভিন্ন উপায়ে তাঁর বিরোধীতা করা হত এবং তাঁকে নির্যাতন করা হত।" (মালফুযাত, ৪র্থ খণ্ড, পৃষ্ঠা: ৬৫)

সৈয়্যদানা হযরত মসীহ মওউদ (আ.) আঁ হযরত (সা.)-এর বিনয় সম্পর্কে উল্লেখ করে উপদেশ করেন: " কেবল মিথ্যা আস্ফালন ও অনর্থক অহংকার প্রদর্শন করা থেকে বিরত থাকা উচিত এবং বিনয় অবলম্বন করা উচিত। আমাদের নবী (সা.) বস্তুতঃ যিনি সব থেকে বড় বুযুর্গ ছিলেন তাঁর বিনয়ের নমুনা কুরআন শরীফে বিদ্যমান। লিখিত আছে যে, একজন জন অন্ধ আঁ হযরত (সা.) -এর কাছে কুরআন শরীফ পড়ত। একদিন মহানবী (সা.)-এর কাছে মক্কার প্রমুখ নেতা ও সর্দাররা একত্রিত হয়ে কথাবার্তা আরম্ভ করল এবং তিনি (সা.) তাদের সঙ্গে কথা বলতে বলতে ব্যস্ত হয়ে পড়লেন। ব্যস্ততার কারণে কিছুটা বিলম্ব হলে সেই অন্ধ ব্যক্তি সেখান থেকে চলে যায়। এটি একটি তুচ্ছ বিষয় ছিল। আল্লাহ্ তা'লা এ বিষয়ে একটি সুরা অবতীর্ণ করলেন। এরপর আঁ হযরত (সা.) সেই ব্যক্তির বাড়ি গিয়ে তাকে সঙ্গে করে নিয়ে এসে নিজের চাদর বিছিয়ে তার উপর বসতে দিলেন। বস্তুতঃ যাদের হৃদয়ে খোদা তা'লার মহত্ব থাকে তাদেরকে আবশ্যিকভাবে বিনয়ী হতে হয় কেননা তারা খোদা তা'লার উদাসনীতা সম্পর্কে সব সময় ভীত থাকে। " এর তিনি (আ.) একটি ফার্সি পঙক্তি বর্ণনা করেন যার অর্থ হল- " যারা আরিফ (মারেফাতের জ্ঞান প্রাপ্ত), যারা খোদা তা'লা সম্পর্কে বেশি জ্ঞান রাখেন তারা বেশি ভয় করে। কেননা যেভাবে আল্লাহ্ তা'লা অন্তর্দৃষ্টি প্রদান করেন অনুরূপে তিনি সূক্ষ্ম বিষয়ে গ্রেপ্তারও করেন। যদি তিনি কোন কাজে অসন্তুষ্ট হয়ে যান তবে নিমেষেই সমস্ত কিছু ধ্বংস প্রাপ্ত হবে। অতএব তোমাদের উচিত এবিষয়ে ভেবে দেখা, এ বিষয়টিকে স্মরণ রাখা এবং এর উপর আমল করা"

(মালফুযাত, ১০ম খণ্ড, পৃষ্ঠা: ৩৪৩-৩৪৪)

আঁ হযরত (সা.)-এর গুণাবলীর সৌন্দর্য্য প্রত্যেকটি বৈশিষ্টকে পরিবেষ্টন করে আছে। সবগুলি একটি মজলিসে বর্ণনা করা সম্ভব নয়, কয়েকটি মজলিসে বর্ণনা করাও সম্ভব নয়। এখন আমি তাঁর গুণাবলীর একটি আঙ্গিক সম্পর্কে বর্ণনা করব সেটি হল তাঁর বদান্যতা ও উদারতা।

হযরত ইবনে উমর (রা.) বর্ণনা করেন, আমি আঁ হযরত (সা.)-এর থেকে উত্তম বীর, সম্মানীয়, মহানুভব ও জ্যোতির্ময় ব্যক্তি দেখি নি। (সুনানুদ দারামী) প্রতীত হয়, সাহাবাদের নিকট আঁ হযরত (সা.)-এর গুণাবলী বর্ণনা করার শক্তিই ছিল না। একটি উৎকৃষ্ট গুণ বর্ণনা করার চেষ্টা করলে আরও চারটি গুণাবলী সামনে এসে যায়।

আরও একটি বর্ণনায় আছে যে, আঁ হযরত (সা.)-এর নিকট কয়েকজন আনসার কোন জিনিস চাইলেন। তিনি (সা.) সেটি দিয়ে দিলেন। তারা পুনরায় চাইলেন এবং চাইতে থাকলেন এমনকি তাঁর কাছে যা কিছু ছিল শেষ হয়ে গেল। তিনি (সা.) বললেন, আমার কাছে কোন সম্পদ থাকলে আমি আমি তা আটকে রাখি না। (সহী বুখারী, কিতাবুয যাকাত)

একবার মহানবী (সা.)-এর কাছে কোথা থেকে নব্বই হাজার দিরহাম আসে। তিনি (সা.) সেগুলি সেখানেই বিলিয়ে দেন। (উয়ুনুল আসার, ২য় খণ্ড, পৃষ্ঠা: ৩৯৮) একবার তিনি একজন যাচনাকারীকে একপাল ছাগল দান করলেন যা পুরো উপাত্যকা জুড়ে ছড়িয়ে ছিল। (সহী মুসলিম, কিতাবুল ফাযায়েল) একবার তাঁর (সা.)-নিকট বাহরীন থেকে পণ্য নিয়ে আসা হয়। পণ্যদ্রব্যের স্তূপ লেগেছিল। তিনি (সা.) মসজিদের বাইরে সেই পণ্যকে স্তূপীকৃত করে রাখার আদেশ দিলেন। তিনি (সা.) যখন নামায পড়তে আসলেন তখন সেদিকে দৃষ্টি দিলেন না। নামায শেষ করে এসে সেই সমস্ত মালপত্র বিলিয়ে দিলেন। (বুখারী, কিতাবুস সালাত) তাঁর কোমলতা ও বদান্যতার কারণেই বেদুঈনরাও যাচনা করতে গিয়ে অনেক সময় অত্যন্ত অভব্য ও অমার্জিত আচরণ করে বসত। কিন্তু তিনি সমস্ত শক্তির নিয়ন্ত্রক ও প্রশাসক হওয়া সত্বেও তাদের অভব্যতা ও অসৌজন্যমূলক আচরণকে উপেক্ষা করতেন এবং তাদেরকে দান করতেন। (সহী বুখারী, কিতাবুল জিহাদ)

আম্বিয়া ও আওলিয়াগণ কাঠিন্যের যুগেরও সম্মুখীন হন আবার সাচ্ছন্দ্য ও বিজয়ের যুগও তারা দেখে থাকেন। হযরত মসীহ মওউদ (আ.) এ প্রসঙ্গে বলেন: এই দুটি যুগই আবশ্যকীয় যাতে প্রত্যেক অবস্থাতে তাদের আদর্শ জগতের সামনের উন্মোচিত হয়। দুনিয়াদার মানুষ কাঠিন্য ও দুর্বলতার যুগে বিনয় অবলম্বন করে। সমস্যা জর্জরিত হলে খোদা তা'লার দিকেও বিনত হয়। তারা উত্তম আচরণও করে থাকে। সামর্থ্য অনুযায়ী গরীবদেরকে সাহায্যও করে থাকে। তাদেরকে যাতনা দানকারীদেরকে উত্তর দেওয়ার শক্তি না থাকার কারণে নীরব থাকে এবং বলে আমরা ধৈর্য্য অবলম্বন করেছি। কিন্তু যখন তারা শক্তি অর্জন করে সেই সময় মানুষের প্রতি সংবেদনশীল হওয়া, উত্তম আচরণ করা এবং ক্ষমাশীল হওয়াই প্রকৃত গুণ। অতএব দুর্বলতা এবং শক্তিমত্তা এই দুটি অবস্থাই বস্তুতঃ কারোর উচ্চ নৈতিকতা বিচারের মাপকাঠি। তিনি বলেন, শক্তিমত্তা এবং বিজয়ী হওয়া এই কারণেই জরুরী। কেননা, যাতনা দানকারীদের অপরাধ ক্ষমা করা, শত্রুকে ভালবাসা, মন্দাভিলাষীদের জন্য হিতাকাঙ্খী হওয়া, ধন-সম্পদ থেকে বিমুখতা, সম্পদের অহংকারে মত্ত না হওয়া, সম্পদশালী অবস্থায় কার্পণ্য না করা, বদান্যতা প্রদর্শন করা, সম্পদের প্রাচুর্যের কারণে নিজেকে উপাস্য জ্ঞান না করা এবং প্রশাসনিক ক্ষমতাকে জুলুম ও নির্যাতনের অস্ত্র হিসেবে প্রয়োগ না করা- এগুলি এমন সব নৈতিক বিষয় যেগুলি প্রমাণের জন্য সম্পদশালী ও শক্তিশালী হওয়ার শর্ত প্রযোজ্য। এবং এটি তখনই প্রমাণিত হয় যখন মানুষ সম্পদ ও ও শক্তি এই দুইয়েরই অধিকারী হয়। যেহেতু দুর্যোগপূর্ণ যুগ এবং শক্তি ও সামর্থ্যের যুগ ছাড়া এই দুই প্রকারের নৈতিক অবস্থা প্রকাশ পাওয়া সম্ভব নয়, এই কারণে খোদা তা'লার পূর্ণ প্রজ্ঞার দাবি হল, আম্বিয়া ও আওলিয়াগণকে এই দুই প্রকার অবস্থা দ্বারা উপকৃত করা যা শত-সহস্র নিয়ামতরাজির সমন্বয়। কিন্তু এই দুই অবস্থা সংঘটিত হওয়ার যুগ প্রত্যেকের জন্য একই ক্রমে আসে না। বরং খোদা তা'লার প্রজ্ঞার অধীনে অনেকের জন্য শান্তি ও সাচ্ছন্দের সময় জীবনের প্রথম যুগে এসে থাকে এবং দুঃখ-কষ্টের যুগ পরবর্তী কালে। আবার কারো কারো জন্য প্রথম যুগে দুঃখ-কষ্ট এসে থাকে এবং শেষ যুগে ঐশী সাহায্য ও সমর্থন প্রাপ্তি ঘটে। কারোর কারোর ক্ষেত্রে এই দুটি অবস্থা প্রচ্ছন্ন থাকে আবার কারোর কারোর ক্ষেত্রে এটি প্রবলভাবে প্রকট হয়ে থাকে। এক্ষেত্রে সর্বাপেক্ষা উচ্চ মর্যাদা হল হযরত খাতামুল আম্বিয়া মহম্মদ (সা.)-এর। কেননা আঁ হযরত (সা.)-এর উপর এই দুটি অবস্থা এমন স্পষ্টভাবে পূর্ণ হয়েছিল যা উৎকর্ষের পরম পর্যায় ছিল এবং এমন পর্যায়ক্রমে এসেছিল যার ফলে আঁ হযরত (সা.)-এর সমস্ত উৎকৃষ্ট গুণাবলী দিবালোকের ন্যায় স্পষ্ট হয়ে গিয়েছিল এবং এর দ্বারা إِنَّكَ لَعَلىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ (আল-কালাম: ৫)-এর বিষয়টি প্রমাণ হয়। এবং আঁ হযরত (সা.)-এর চরিত্র উভয় প্রকারে পরম উৎকর্ষতা সহকারে প্রমাণ হওয়া সমস্ত আম্বিয়াগণের চরিত্রকে প্রমাণ করে। কেননা, তিনি (সা.) তাদের নবুয়ত এবং কিতাবসমূহের সত্যায়ন করেছেন এবং তাদেরকে খোদা তা'লার নৈকট্যভাজন রূপে সামনে এনেছেন।"

যুগ ইমামের বাণী

অতএব, কুরআন শরীফ অনুধাবন করা এবং সেই অনুযায়ী হিদায়াত লাভের জন্য তাকওয়া প্রধান ও আবশ্যক বিষয়।

(মালফুযাত, ৫ম খণ্ড, পৃ: ১২১)

দোয়াপ্রার্থী: Late-Rafiquddin Ahmad & Afifa Begum, From Latiful Haque Sb., Kandi (MSD)

যুগ খলীফার বাণী

সকল প্রকার অসত্য বচন ও প্রতারণার বিরুদ্ধে অভিযানের নেতৃত্ব দেওয়া এবং নিজেদের ব্যক্তিগত দৃষ্টান্ত স্থাপন করা আহমদী যুবকদের দায়িত্ব। [হযরত খলীফাতুল মসীহ আল খামিস (আই.)]

দোয়াপ্রার্থী: Sujauddin Sk., Barisha, Kolkata

(বারাহীনে আহমদীয়া, রুহানী খাযায়েন, ১ম খণ্ড, পৃষ্ঠা: ২৮২-২৮৫)

কৃতজ্ঞতাপরায়ণ হওয়া আরও একটি গুণ যার সঠিক ব্যুতপত্তি এবং পরম মার্গ আমরা আঁ হযরত (সা.)-এর আদর্শে দেখতে পাই। তিনি আল্লাহ্ তা'লার প্রতি কৃতজ্ঞতার ক্ষেত্রেও উৎকৃষ্টতম দৃষ্টান্ত স্থাপন করেছেন এবং বান্দাদের প্রতিও তাঁর অনুরূপ আচরণ পরিলক্ষিত হয়। তিনি (সা.) দোয়া করতেন যে, হে আল্লাহ্! তুমি আমাকে তোমার প্রতি কৃতজ্ঞ ও তোমাকে স্মরণকারী বান্দায় পরিণত কর। (সুনান আবু দাউদ, আবওয়াবুল বিতর) তিনি প্রথম বৃষ্টির প্রথম বিন্দুটি জিহ্বা উপর নিতেন, কেননা আল্লাহ্ তা'লার এই নিয়ামতের প্রতি কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপনের এটিই পদ্ধতি। তাঁর আহার ছিল অত্যন্ত সাদামাটা। কিন্তু তাসত্ত্বেও তিনি (সা.) আল্লাহ্ তা'লার প্রতি অশেষ কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করতেন। তিনি (সা.)- আমাদেরকে এই দোয়াই শিখিয়েছেন। তিনি (সা.) কখনো একটি খেজুর সহকারে রুটি খাচ্ছেন, তো কখনো কেবল ঝোল সহকারে। কিন্তু আল্লাহ্ তা'লার প্রতি কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করছেন কারণ তিনি এই খাদ্যের ব্যবস্থা করেছেন। (সহী বুখারী, কিতাবুল আতইমাহ) তিনি (সা.) নতুন বস্ত্র পরিধান করলেও আল্লাহ্ তা'লার প্রতি কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করতেন। (সুনান তিরমিযী, কিতাবুল লিবাস) মোটকথা, এমন কোন বস্তু নেই যা ব্যবহার করার পূর্বে তিনি (সা.) আল্লাহ্ তা'লার গুণকীর্তন এবং কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করতেন না। যখন তাঁকে (সা.) ইবাদতে অত্যন্ত অনুনয়-বিনয় অবলম্বন করতে দেখে জিজ্ঞাসা করা হয় যে, আপনি ইবাদত করার জন্য দাঁড়ালে আপনার পা দুটি ফুলে যায়। সেজদায় অত্যন্ত ব্যাকুল থাকেন এবং এত কাঁদেন যে চোখের পানিতে মাটি ভিজে যায়। অথচ আল্লাহ্ তা'লা আপনার পিছনের ও পরের সমস্ত পাপ ক্ষমা করে দিয়েছেন। কোন পাপও আপনার দ্বারা সংঘটিত হয় না আর না পূর্বে কখনো হয়েছে। তবে আপনি এত কেঁদে কেঁদে দোয়া করেন কেন? তিনি (সা.) উত্তর দিলেন, আল্লাহ্ তা'লা আমাকে যে এত কিছু দিয়েছেন তার জন্য কৃতজ্ঞ বান্দা হয়ে আমি কি তাঁর কাছে কেঁদে কেঁদে দোয়া করব না? (সহী বুখারী, কিতাব তাফসীরুল কুরআন)

বান্দাদের প্রতি কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপনের মান কেমন ছিল? হযরত আবু বাকার সিদ্দিক (রা.) মহানবী (সা.)-এর বাল্যকালের বন্ধু ছিলেন যিনি প্রত্যেক কঠিন পরিস্থিতিতে তাঁর সঙ্গ দিয়েছেন। মহানবী (সা.) তাঁর ভাবাবেগের প্রতি অত্যন্ত সংবেদনশীল ছিলেন। একবার একব্যক্তি কোন মতভেদের কারণে হযরত আবু বাকার (রা.) কে কিছু বলে ফেলে তখন মহানবী (সা.) সেই ব্যক্তিকে বললেন, যখন আল্লাহ্ তা'লা আমাকে প্রত্যাদিষ্ট করে পাঠালেন তখন সকলে আমাকে মিথ্যাবাদী বলল, কিন্তু আবু বাকার আমার সত্যতার সাক্ষ্য দিয়েছেন এবং নিজের সম্পদ ও জীবন দিয়ে আমার সাহায্য করেছেন। তুমি কি আমার সাথীকে মনোঃপীড়া দেওয়া থেকে বিরত হতে পার না? আরও একটি স্থানে মহানবী (সা.) বলেন, আমার উপর সব থেকে বেশি অনুগ্রহ করেছেন হযরত আবু বাকার (রা.)। (সহী বুখারী, কিতাবুস সালাত)। মহানবী (সা.)-এর উপর কে আর অনুগ্রহ করতে পারে! তাঁর জন্য কিছু উৎসর্গ করা উৎসর্গকারীর জন্য সম্মানের বিষয় ছিল, এছাড়াও বাহ্যিকভাবেও তিনি (সা.) প্রত্যেককে প্রতিদানে অনেক বেশি দিয়েছেন। কিন্তু তাসত্ত্বেও তিনি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করতেন।

হযরত আয়েশা (রা) আঁ হযরত (সা.)-কে বার বার হযরত খাদীজা (রা.)কে স্মরণ করে তাঁর প্রশংসা করার কারণে বলতেন, আপনি কেন সব সময় সেই বৃদ্ধার কথা বলেন, অথচ আল্লাহ্ তা'লা আপনাকে তাঁর থেকে অনেক সুন্দর স্ত্রী দান করেছেন। এর উত্তরে আঁ হযরত (সা.) বললেন, যখন সকলে আমাকে প্রত্যাখ্যান করেছিল তখন তিনি (রা.) আমাকে গ্রহণ করেছিলেন। যখন মানুষ আমাকে অস্বীকার করল তখন তিনি ঈমান এনেছিলেন। যখন আমাকে ধন-সম্পদ থেকে বঞ্চিত করা হল, তখন তিনি আমাকে নিজের ধন-সম্পদ দিয়ে আমার সাহায্য করেছেন এবং আল্লাহ্ তা'লা আমাকে তাঁর মাধ্যমেই সন্তান দান করেছেন। (আসাদুল গাবা, ৭ম খণ্ড)। মহানবী (সা.) হযরত খাদীজা (রা.)-এর সেই সব সেবাকে কখনো ভুলেন নি যা তিনি (রা.) একজন স্ত্রী হিসেবে স্বামীর জন্য করেছিলেন। সেগুলিকে তিনি (সা.) অনুগ্রহ মনে করতেন এবং আজীবন তাঁর প্রতি কৃতজ্ঞ ছিলেন। বর্তমান যুগের স্বামীদের জন্য এটি একটি শিক্ষনীয় বিষয়। কেননা তারা স্ত্রীর সম্পদও আত্মসাত করে উপরন্ত তাদেরকে বলে যে, এখনও তাদেরকে অনুগ্রহ বশতঃ স্ত্রীর মর্যাদা দিয়ে রেখেছে।

এছাড়াও মহানবী (সা.) ইথিওপিয়ার নাজাশী বাদশাহ্‌র অনুগ্রহকে সবসময় কৃতজ্ঞ চিত্তে স্মরণ রাখতেন , যিনি কুফ্ফারদের নির্যাতনে অতিষ্ঠ হিজরতকারী মুসলমানদেরকে নিজের দেশে আশ্রয় দান করেছিলেন। একবার নাজাশি বাদশার একটি প্রতিনিধি দল আঁ হযরত (সা.) -এর সমীপে উপস্থিত হলে তিনি (সা.) স্বয়ং অভ্যর্থনা জানানোর জন্য উঠে দাঁড়ান। সাহাবাগণ বললেন, আমরা অভ্যর্থনা জানানোর জন্য যথেষ্ট, আমরা উঠে দাঁড়াচ্ছি। তিনি (সা.) বললেন, বাদশা আমাদের সঙ্গীদেরকে সম্মান জানিয়েছিলেন এবং তাদের সঙ্গে উত্তম আচরণ করেছিলেন। এই কারণে সেই অনুগ্রহের প্রতিদান আমি স্বয়ং দিতে চাই।

(সীরাতুল হুলবিয়া, ৩য় খণ্ড, পৃষ্ঠা: ৭২)

এরপর আমরা মহানবী (সা.)-কে যখন একজন নীতি শিক্ষক হিসেবে দেখি, তখন এখানেও আমরা তাঁর আদর্শের বিচিত্র মর্যাদা লক্ষ্য করি। একবার হযরত আয়েশা (রা.) হযরত সুফিয়া (রা.)-এর অনতিদীর্ঘ হওয়ার দিকে ইঙ্গিত করে হাসি-ঠাট্টার ছলে কোন কথা বলেছিলেন। মহানবী (সা.) বলেন: আয়েশা! এটি এমন একটি কথা, যদি সমুদ্রে মিশিয়ে দেওয়া হয় তবে তাও কলুষিত হয়ে উঠবে।

(সুনানুত তিরমিযী, কিতাব সাফাতুল কিয়ামাহ)

ছোটদের তরবীয়ত এবং উত্তম আচরণ শেখানোর জন্য মহানবী (সা.)-এর নমুনা কেমন ছিল? একজন সাহাবী আব্দুল্লাহ্ বিন আমির বর্ণনা করেন, একবার আঁ হযরত (সা.) আমাদের কাছে আসেন। আমি সেই সময় ছোট ছিলাম। আমি খেলার জন্য বাইরে যাচ্ছিলাম তখন আমার মা বললেন আব্দুল্লাহ্ এদিকে এস তোমাকে একটি জিনিস দিব। আঁ হযরত (সা.) তাকে বললেন, তুমি কি তাকে কিছু দিতে চাইছ? আমার মা বললেন, হ্যাঁ আমি তাকে খেজুর দিব। মহানবী (সা.) সত্যিই তোমার এমন অভিপ্রায় না থাকত এবং ছেলেকে কেবল কাছে ডাকার জন্য এমনটি বলতে তবে মিথ্যাবাদী হওয়ার গুনাহ করতে আর মিথ্যা আল্লাহ্ তা'লার নিকট অনেক বড় পাপ।

(সুনান আবু দাউদ, কিতাবুল আদাব)

অতএব সত্য প্রতিষ্ঠা করার এটিই মান যা মহানবী (সা.) তাঁর মান্যকারীদের কাছে প্রত্যাশা করেছেন। প্রতিবেশীর সঙ্গে সদ্ব্যবহারের শিক্ষা রয়েছে, এ বিষয়ে তিনি (সা.) কিভাবে তরবীয়ত করেছেন? মহানবী (সা.)-কে একব্যক্তি জিজ্ঞাসা করে যে , হে রসুলুল্লাহ (সা.)! আমি কিভাবে বুঝতে পারব, আমি ভাল কাজ করছি না মন্দ কাজ করছি? মহানবী (সা.) বললেন, যখন তোমার প্রতিবেশীকে একথা বলতে শুনবে যে, তুমি খুব ভাল, তখন তুমি মনে করবে যে, তোমার আচার-আচরণ ভাল। আর যখন তুমি তোমার প্রতিবেশীকে একথা বলতে শোন যে, তুমি খুব খারাপ তখন মনে কর যে, তোমার আচার-আচরণ মন্দ। তুমি অনুচিত কর্ম করছ।

(সুনাব ইবনে মাজা, কিতাবুয যোহদ)

এই কয়েকটি বিষয় ছিল, আঁ হযরত (সা.)-এর আদর্শের কয়েকটি নমুনা ছিল যা আমি উপস্থাপন করেছি। তিনি (সা.) সমস্ত দিক থেকে পরম মার্গে উপনীত ছিলেন এবং তিনি (সা.) এই অবস্থা তাঁর মান্যকারীদের মধ্যেও দেখতে চেয়েছিলেন। খোদা করুক, আমরা যেন কেবল মৌখিক দাবি না করি, বরং আঁ হযরত (সা.)-এর আদর্শের উপর পরিচালিত হয়ে প্রকৃত আমলকারী হই, তাঁর প্রকৃত অনুসারী হই এবং নিজেদের ক্ষমালাভের উপকরণ সৃষ্টিকারী হই।

হযরত আকদস মসীহ মওউদ (আ.) একটি উদ্ধৃতি উপস্থাপন করব। তিনি (আ.) বলেন: সেই মানব যিনি তাঁর অস্তিত্বে, তাঁর গুণাবলীতে, তাঁর কাজে কর্মে, তাঁর নিরন্তর তৎপরতায় এবং আধ্যাত্মিক ও পবিত্র মানসিকক ক্ষমতাসমূহের মাধ্যমে জ্ঞানে, কর্মে, সাধুতায় ও দৃঢ়তায় সর্বোত্তম দৃষ্টান্ত স্থাপনক করেছেন এবং ইনসানে কামেল বা পরিপূর্ণ মানবরূপে অভিহিত হয়েছেন.......সেই ইনসান যিনি সর্বাপেক্ষা কামেল বা পরিপূর্ণ এবং প্রকৃত অর্থেই যিনি ইনসানে কামেল এবং কামেল নবী এবং যাঁর মাধ্যমে আধ্যাত্মিক অভ্যুথান ও পুনরুত্থন সংঘটিত হওয়ায় পৃথিবীতে প্রথম কেয়ামত প্রদর্শিত হয়েছে এবং মৃত জগৎ পুনরায় জীবন্ত হয়ে উঠেছে, সেই কল্যাণমণ্ডিত নবী হচ্ছেন হযরত খাতামুল আম্বিয়া ইমামুল আসফিয়া খাতামুল মুরসালীন ফখরুন্নবীঈন জনাবে মুহাম্মদ মুস্তাফা (সা.)। হে আমার খোদা! তুমি সেই প্রিয়তম নবীর উপরে সেই রহমত ও দরূদ বর্ষণ কর, যা তুমি পৃথিবীর আদিকারল থেকে অদ্যবধি অন্য কারো উপরেই বর্ষণ করনি। যদি এই আজিমুশশান, মহামহিমান্বিত নবী দুনিয়ার বুকে না আসতেন, তাহলে যে সকল ছোট ছোট নবী যেমন, ইউসুফ (আ.), আইয়ুব (আ.), মসীহ ইবনে মরিয়ম (আ.), মালাকি (আ.), ইয়াহইয়া (আ.) জাকারিয়া (আ.) ইত্যাদি, তাঁদের সত্যতার স্বপক্ষে আমাদের কাছে কোনও প্রমাণই থাকত না, যদিও তাঁরা প্রত্যেকেই ছিলেন খোদা তা'লার প্রিয়পাত্র। এ তো সেই নবীরই (সা.) কৃপা ও অনুগ্রহ যার দরুন এঁরা সবাই পৃথিবীতে সত্য বলে স্বীকৃত হতে পেরেছেন।

اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ وَبَارِكْ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَاَصْحَابِهٖ اَجْمَعِيْنَ وَاٰخِرُ دَعْوَانَا اَنِ الْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعٰلَمِيْنَ۔

(ইতমামুল হুজ্জাত, রূহানী খাযায়েন, ৮ম খণ্ড, পৃষ্ঠা: ৩০৮)

EDITOR
Tahir Ahmad Munir
Sub-editor: Mirza Safiul Alam
Mobile: +91 9 679 481 821
e-mail : Banglabadar@hotmail.com
website:www.akhbarbadrqadian.in
www.alislam.org/badr

REGISTERED WITH THE REGISTRAR OF NEWSPAPERS OF INDIA AT NO PUNBEN/ 2016 / 70524

সাপ্তাহিক **বদর** কাদিয়ান Weekly **BADAR** Qadian

Distt. Gurdaspur (Pb.) INDIA Qadian - 143516

POSTAL REG NO GDP- 43 / 2023 -2025 Vol-10 Thursday, 30 Jan 2025 Issue No.5

MANAGER
SHAIKH MUJAHID AHMAD
Mob: +91 9915379255
e.mail:managerbadrqnd@gmail.com

ANNUAL SUBSCRIPTION : Rs. 600/- (Per Issue : Rs. 12/-) (WEIGHT: 20-50 gms/issue)

(১ম পাতার পর...)

এ প্রসঙ্গে সম্মানীয় বক্তা হযরত মিঞাঁ করীম বখশ সাহেবের ঘটনা, পঞ্চম খিলাফতের নির্বাচনের সময় সমস্ত সদস্যদের এক আদেশে বসে পড়ার ঘটনা, হযরত খলীফাতুল মসীহ আওয়াল (রা.)-এর উপদেশে হযরত আবু আব্দুল্লাহ্‌র সাহেবের ৬৫ বছর বয়সে কুরআন হিফজ করার ঘটনা উপস্থাপন করেন। তিনি বলেন, খিলাফতের আনুগত্য এবং জামাতের ব্যবস্থাপনার আনুগত্য একে অপরের পরিপুরক। এটি একই বিষয়ের দুটি আঙ্গিক। হযরত খলীফাতুল মসীহ আল খামিস (আই.) জামাতের ব্যবস্থাপনার আনুগত্য প্রসঙ্গে বলেন-

"সব সময় স্মরণ রাখবে, তোমাদের লক্ষ্য, তোমাদের জীবনের একমাত্র উদ্দেশ্য হওয়া উচিত খোদা তা'লার সন্তুষ্টি অর্জন এবং আল্লাহ্ ও তাঁর রসুল ও তাঁর ব্যবস্থাপনার যে নিয়ম-কানুন ও সিদ্ধান্ত রয়েছে, সেগুলি মেনে চলা এবং এ বিষয়ে নিজেদের আনুগত্যের মানে কোনও তারতম্য হতে না দেওয়া।"

(খুতবা জুমআ, প্রদত্ত ২৭ শে আগস্ট, ২০০৪)

সম্মানীয় বক্তা যুগ খলীফার প্রতি ভক্তি ও ভালবাসার কয়েকটি ঘটনা উপস্থাপন করার পর বলেন-"আল্লাহ করুন, প্রত্যেক আহমদী নর ও নারী এই অঙ্গীকার পূর্ণকারী হোক। খিলাফতের প্রতি বিশ্বস্ততা ও ভালবাসার উন্নত মান প্রতিষ্ঠিত হোক। আল্লাহ্ তা'লা আমাদেরকে সর্বদা খিলাফতের সঙ্গে সম্পৃক্ত রাখুন আর স্বীয় প্রিয়ভাজনদের ভালবাসা দান করুন। আমীন।"

অধিবেশনের তৃতীয় বক্তব্য পেশ করেন মাননীয় রফিক আহমদ বেগ সাহেব, নাযির বায়তুল মাল আমাদ, কাদিয়ান। তাঁর বক্তব্যের বিষয়বস্তু ছিল, 'আর্থিক কুরবানীর ক্ষেত্রে জামাতের সদস্যদের অতুলনীয় দৃষ্টান্ত এবং ঐশী কল্যাণধারা।' বক্তব্যের শুরুতে কুরআন মজীদের لَنۡ تَنَالُوا الۡبِرَّ حَتّٰی تُنۡفِقُوۡا مِمَّا تُحِبُّوۡنَ আয়াত তেলাওয়াত করেন এবং এর অনুবাদ উপস্থাপন করেন। অনুবাদ: তোমরা আদৌ কোনও পুণ্য লাভ করতে পারবে না, যতক্ষণ পর্যন্ত না তোমরা সেই বিষয় থেকে খরচ কর, যেগুলোকে তোমরা ভালবাস।

এরপর তিনি বলেন- আল্লাহ্ তা'লা এযুগে আমাদেরকে খিলাফতে আহমদীয়া রূপে এক মহান নেয়ামত দান করেছেন, যার মাধ্যমে আমাদের তরবীয়ত এবং আত্মশুদ্ধির উপকরণ সৃষ্টি হচ্ছে। কুরআন করীমে আল্লাহ্‌র পথে খরচ করাকে আত্মশুদ্ধির এক গুরুত্বপূর্ণ মাধ্যম হিসেবে বর্ণনা করা হয়েছে। হুযুর আনোয়ার জামাতের সদস্যদেরকে আল্লার রাস্তায় নিজেদের সম্পদ ব্যয় করার প্রতি বারবার আহ্বান করে থাকেন। প্রিয় প্রভুর খুতবা ও ভাষণাদিতে হযরত মসীহ মওউদ (আ.)-এর সাহাবা ও বিশ্বব্যাপী নিষ্ঠাবান আহমদীদের আর্থিক কুরবানীর ঈমান উদ্দীপক ঘটনাবলী আমাদের ঈমানকে সুদৃঢ় করে। আর্থিক কুরবানীর এই সকল ঘটনাবলী সাহাবাদের কুরবানীর স্মৃতিকে জাগিয়ে দেয়।

সম্মানীয় বক্তা এ প্রসঙ্গে হযরত খলীফাতুল মসীহ আল খামিস (আই.), হযরত মুনশী জাফর আহমদ সাহেব কপুরথলবী (রা.)-এর আঁ হযরত (সা.) বলেন, দুই ব্যক্তি ছাড়া অন্য কারোর উপর ঈর্ষা করা উচিত নয়। প্রথম, সেই ব্যক্তি যাকে আল্লাহ্ তা'লা সম্পদ দিয়েছেন আর সে সেই সম্পদ থেকে আল্লাহর রাস্তায় ব্যয় করে।দ্বিতীয়, সেই ব্যক্তি যাকে আল্লাহ্ তা'লা জ্ঞান-বুদ্ধি ও প্রজ্ঞা দান করেছেন এবং সেই জ্ঞানের সাহায্যে সে মানুষের মাঝে বিচার করে এবং মানুষকে শেখায়।

সম্মানীয় বক্তা পৃথিবীর বিভিন্ন ঈমান উদ্দীপক ঘটনা বর্ণনা করেন। এবং শেষে হযরত মসীহ মওউদ (আ.)-এর রচনা 'ইজালায়ে আওহাম' থেকে তাঁর একটি উদ্ধৃতি উপস্থাপন করে বক্তব্য শেষ সমাপ্ত করেন।

দ্বিতীয় দিন, দ্বিতীয় অধিবেশন।

দ্বিতীয় দিনের দ্বিতীয় অধিবেশনের সভাপতিত্ব করেন মাননীয় সৈয়্যদ তানভীর আহমদ সাহেব,সদর মজলিস ওয়াকফে জাদী। মাননীয় হাফিজ ফারুখ আহমদ আজম সাহেব সূরা হিজরাত-এর ১২-১৪ নং আয়াত তিলাওয়াত করেন। অতঃপর মাননীয় শামীম আহমদ গৌরী সাহেব, সদর মজলিস খুদ্দামুল আহমদীয়া ভারত, তিলাওয়াতকৃত আয়াতসমূহের উর্দু অনুবাদ উপস্থাপন করেন। এরপর মাননীয় মুরশিদ আহমদ ডার এবং তাঁর সঙ্গীরা সমবেত কণ্ঠে হযরত মুসলেহ মওউদ (রা.) রচিত একটি নযম পরিবেশন করেন। 'মেরি রাত দিন বাস এহি এক সাদা হ্যয়'

এরপর অধিবেশনের প্রথম বক্তব্য রাখেন মাননীয় মৌলানা মুনীর আহমদ খাদিম সাহেব। তাঁর বক্তব্যের বিষয়বস্তু ছিল "হযরত মুসলেহ মওউদ (রা.)-এর ভাষণ - আহমদীয়াত ইয়ানী হাকীকী ইসলাম'-এর পটভূমি এবং সুদুরপ্রসারী প্রভাব। " তিনি তাঁর বক্তব্যের শুরুতে সৈয়্যদানা হযরত মসীহ মওউদ (আ.) একটি স্বপ্ন বর্ণনা করেন, যাতে তিনি দেখেন, লন্ডন শহরে একটি মেম্বারে দাঁড়িয়ে আছেন এবং ইংরেজিতে অত্যন্ত শক্তিশালী যুক্তিসমৃদ্ধ ভাষণ দ্বারা ইসলামের সত্যতা প্রকাশ করছেন। হযরত মসীহ মওউদ আ.) এই স্বপ্নের ব্যাখ্যায় বলেন- 'আমি না হলেও, আমার লেখনী তাদের বিস্তার লাভ করবে এবং বহু সত্যান্বেষী ইংরেজ সত্যের শিকার হবে।

হযরত মুসলেহ মওউদ (রা.) কতিপয় এমন স্বপ্ন দেখেছেন যা থেকে হযরত মুসলেহ মওউদ (রা.) এই উপসংহার বের করেছেন যে, বিলেতে সফর করা এবং সম্মেলনে ভাষণ দেওয়া আল্লাহ্ তা'লার অভিপ্রায় আর তাঁর নিয়তির মাধ্যমে হবে। এই সফরে হুযুর রেলে করে মুম্বই পোঁছন এবং মুম্বই থেকে জলজাহাজে করে এডেনের উদ্দেশ্যে রওনা হন। এডেন বন্দর থেকে তিনি সাঈদ বন্দর এবং কায়েরো থেকে বায়তুল মুকদ্দস, সেখান থেকে সিরিয়া এবং সব শেষে লন্ডন পোঁছন।

হুযুর (রা.) লন্ডনে কয়েক সপ্তাহ অবস্থান করেন এবং সেই সময় তিনি সেখানে ইসলামের তবলীগের বিষয়ে একাধিক পরিকল্পনা করেন। ব্রিটিশ সংবাদ মাধ্যমে হুযুরের লন্ডন আগমণ, তাঁর ব্যক্তিত্ব, ইউরোপে ইসলাম প্রসারের বিষয়ে তাঁর সংকল্প প্রভৃতি বিষয়ে আলোচনা হয়। কিছু বিদ্বেষপরায়ন ক্যাথলিক মতবাদে বিশ্বাসী পত্রিকাগুলি লিখেছিল যে, এটা খৃষ্টধর্মের বিরুদ্ধে একটি ষড়যন্ত্র। কেউ কেউ লিখেছিল, ব্রিটেনে আগমণকারী কোন লর্ডকেও এমন কভারেজ দেওয়া হয় না, যতটা দেওয়া হয়েছে আহমদীয়া জামাতের ইমামকে। এই সফরে হুযুর (রা.) ১৯২৪ সালের ১৯ শে অক্টোবর ব্রিটেনের সর্বপ্রথম মসজিদ 'ফজল মসজিদ'এর গোড়াপত্তন করেন।

হুযুর (রা.)-এর যুগান্তাকারী ভাষণ যা শ্রোতাদেরকে এক ঘন্টা পর্যন্ত বিস্ময়ের সাগরে নিমজ্জিত রেখেছিল, সেই ভাষণ সম্পর্কে তাবড় তাবড় বিদ্বান ও বিশ্লেষকরা নিজেদের মতামত ব্যক্ত করেছিলেন। সেই সময়ের পত্রিকা মাঞ্চেস্টার গার্ডেন লেখে-

"এই কনফারেন্সে এক আলোড়ন সৃষ্টিকারী ঘটনা প্রকাশ পায়। সেটা হল আজ বিকেলে ইসলামের এক নতুন ফির্কার উল্লেখ। 'নতুন ফির্কা' শব্দটি আমরা সহজবোধ্যতার জন্য ব্যবহার করেছি। অন্যথায় এরা এই শব্দটিকে সঠিক মনে করে না। তাদের মতে, আজ থেকে চৌত্রিশ বছর পূর্বে এই ফির্কার ভিত্তি স্থাপন করেন সেই মসীহ যার ভবিষ্যদ্বাণী বাইবেল ও অন্যান্য ধর্মগ্রন্থে বিদ্যমান। এই সম্প্রদায়টির দাবি, খোদা তা'লা স্পষ্ট ইলহামের মাধ্যমে এই সেলসেলার ভিত রচনা করেছেন, যাতে তিনি মানবজাতিকে ইসলামের মাধ্যমে খোদা তা'লা পর্যন্ত পোঁছে দেন। সাদা পাগড়ি পরিহিত এক ভারতীয়, যার চেহারা জ্যোতির্মণ্ডিত এবং আনন্দময় এবং কালো দাড়ি-বিশিষ্ট যাঁর উপাধি 'হযরত খলীফাতুল মসীহ আল হাজ মির্জা বশীরুদ্দীন মাহমুদ আহমদ বা সংক্ষেপে খলীফাতুল মসীহ। ....তিনি বক্তব্য রাখেন 'ইসলামে আহমদীয়া আন্দোলন'। লাল রোমী টুপি পরিহিত তাঁর এক শিষ্য ভাষণটি পাঠ করে শোনান। ইসলামের সমর্থনে লেখা তাঁর বক্তব্যটি এক জোরালো আবেদনের সাথে সমাপ্ত করেন। যাতে তিনি উপস্থিত শ্রোতাদের এই নতুন মসীহ ও নতুন শিক্ষাকে গ্রহণ করার আহ্বানন জানান। (ক্রমশ....)

যুগ খলীফার বাণী

যদি তোমরা ইহকাল ও পরকালের সফলতা এবং মানুষের মন জয় করতে চাও, তবে পবিত্রতা অবলম্বন কর, নিজেকে পরিছন্ন রাখ এবং নিজের উত্তম আচরণের নমুনা প্রদর্শন কর। তবেই তোমরা সফলকাম হবে।

(খুতবা জুমা, প্রদত্ত ১লা জানুয়ারী, ২০১৬)

দোয়াপ্রার্থী: Azkarul Islam, jamat Ahmadiyya Amaipur (Birbhum)

Printed & Published by: Jameel Ahmed Nasir on behalf of Nigran Board of Badar. Name of Owner: Nigran Board of Badar. And printed at Fazle-Umar Printing Press. Harchowal Road, Qadian, Distt. Gurdaspur-143516, Punjab. And published at office of Weekly Badar Mohallah - Ahmadiyya, Qadian Distt. Gsp-143516, Punjab. India. Editor: Tahir Ahmad Munir